সুধাসঙ্কেত

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়



করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট :
অহিভূষণ মল্লিক

মুদ্রাকর :
শ্রীগণেশপ্রসাদ সরাফ্
মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড
১৭৬, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

দাম :

দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

॥ উৎসর্গ ॥

শ্রীমতী গীতা রায়

কল্যাণীয়াসু

পাঠক্রম

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর
এই মর্ত্যভূমি
দূরের মিছিল
মনে মনে
মুখর লণ্ডন
ছায়া মারীচ
নতুন বাসর
ইভনিং ইন প্যারিস
জন সম্রাট
ব্যালেরিনা
দুর্গতোরণ
প্রদক্ষিণ
নীলকণ্ঠী

সুধাসঙ্কেত

॥ সুধাসঙ্কেত ॥

তখনও সমুদ্রের জলে শেষ রাত্রির অন্ধকার কাঁপছে।

নাবিকের কোলাহলে আমি ডেকে এসে দাঁড়ালাম। দূরে বন্দরে অসংখ্য আলো জ্বলছে। খালাসীরা পুরু দড়ি নিয়ে প্রস্তুত, সঙ্কেত পেলেই নোঙর ফেলবে।

বন্দরের নাম এডেন। শুনেছি বহু ভারতীয় নাকি এখানে নানা রকম ব্যবসা করে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এসব কথা আমার মনে পড়েনি। ভোর রাত্রে আমি বিস্মিত হয়ে বিরাট জাহাজের বন্দরে নোঙর ফেলবার দৃশ্য দেখছিলাম।

দূরের আলোগুলি আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসছে। ঘন ঘন বাজছে জাহাজের বাঁশী। অশান্ত জলরাশির উন্মত্ত গর্জন কানে এসে লাগছে। এমন আশ্চর্য দৃশ্য আমি আর কখনও কোথাও দেখিনি। আর দূরে যে ভূমিখণ্ড দেখা যাচ্ছে, তাকে মনে হচ্ছে রহস্যময়—মনে হচ্ছে মানুষের নাগালের বাইরে কোনো আশ্চর্য স্বপ্নপুরী।

ইচ্ছে করলে ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে বন্দরে নেমে ঘুরে বেড়ান যায়। যেখানে জাহাজ বেশিক্ষণ থামে, ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি সেখানে অনেকেই নেমে যায়, ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে।

আমি ইচ্ছে করেই কখনও কোথাও নামিনি। মনে শিশুসুলভ ভয় ছিল যদি ঠিক সময়ে ফিরে আসতে না পারি, যদি আমাকে না নিয়ে

জাহাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু আজ এডেন যেন আমাকে ডাকল, আর মনে হল এখানে নামতেই হবে।

রাতের অন্ধকারে যাকে স্বপ্নপুরী বলে মনে হচ্ছে, দেখতে হবে দিনের আলোয় তাকে কি বলে মনে হয়। আর কেউ যদি এখানে নামতে রাজি না হয় তাহলে ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে আমি একাই এডেনে নামব।

অনেকদিন পর দেশে ফিরছি। এ জাহাজে যারা আছে তাদের মধ্যে অসংখ্য যাত্রী বিদেশে অধ্যয়ন পর্ব শেষ করে আবার ভারতবর্ষে ফিরছে। লক্ষ করেছি তাদের চোখে আশা, মুখে গর্বের ছাপ।

যথা সময়ে জাহাজ নোঙর ফেলল। কিন্তু কই এডেন কাছে এল না তো। আগের মতোই দূরে রয়ে গেল। কেমন করে নেমে শহরে যাব? চারপাশে জল থৈ থৈ করছে। তবে কি এখানে নামা যাবে না?

কিন্তু আমার যখন জেদ চেপে গেছে তখন যেমন করে হোক আমাকে নামতেই হবে এখানে।

এক খালাসীকে জিজ্ঞেস করে খবর নিলাম, জাহাজ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা এখানে থাকবে, অর্থাৎ কাল ভোর রাত্রে এখান থেকে ছাড়বে আবার।

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খাবার পর ক্যাপ্টেনকে আমার মনের কথা জানালাম। ক্যাপ্টেন হেসে বলল, আমি ইচ্ছে করলেই এখানে নামতে পারি। তবে রাত আটটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। জাহাজ থেকে নেমে নৌকোয় চড়ে বন্দরে যেতে হবে।

কিন্তু আর কেউ নামতে চাইল না এখানে। বন্ধুরা আমাকে বোঝাল, এখানে দেখবার কিছু নেই, শুধু শুধু অত কষ্ট করে কি হবে এডেন বন্দর দেখে?

একটি লোকও যখন নামল না তখন আমি একা জাহাজ থেকে নেমে মোটর বোটে চড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাঙায় পৌঁছলাম।

বন্দরে অনেক লোক। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পাশপোর্ট দেখিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

দিনের আলো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলেও এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখলাম তখনও বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। আর দূরে আমাদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে। ডাঙা থেকে একেবারে অন্য রকম মনে হচ্ছে সেই ভাসমান অট্টালিকাকে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছেনা যে, এই জাহাজ থেকে আমি এইমাত্র নেমে এলাম। কোনদিকে যাব ঠিক করতে না পেরে আমি সেই অজানা শহরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেন আমি নামলাম এখানে? কি প্রয়োজন ছিল? সেকথা যুক্তি দিয়ে আমি কাউকে বোঝাতে পারবনা—হয় তো নিজেকেও নয়। কে যেন হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকেছে। তার আকুল আহ্বান উপেক্ষা করে বধির হয়ে জাহাজে বসে থাকবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু কে সে? আমি জানিনা তার নাম।

সামনে টানা পথ চলে গেছে। এর মধ্যেই লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তাদের রঙ আর পোশাক ইংরেজের মতো। কিন্তু ভাষা ইংরেজী নয়। প্রত্যেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। তারপর নিজেদের মধ্যে কি বলতে বলতে বলতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ইচ্ছে করে আর কারোর কৌতূহল না জাগিয়ে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হবার পর একজন পরিষ্কার ইংরেজীতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

আমি বললাম, কোথাও নয়, এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ওই জাহাজ থেকে নেমেছ বুঝি?

হ্যাঁ। কেমন করে বুঝলে?

লোকটি হেসে বলল, চেহারা দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তার রঙ কালো। চুলও কালো। বছর চল্লিশ বয়স হবে।

সে· আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে তোমার বাড়ি ?

পশ্চিম বাংলায়। আমি কলকাতায় থাকি।

কথা শুনে লোকটি বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে বলল, আমার নাম মিস্টার নন্দী। আমিও একদিন কলকাতায় থাকতাম।

আপনার চেহারা দেখে আমি কিন্তু আপনাকে অবাঙালী ভেবেছিলাম।

লোকটি হেসে বলল, সেকথা ভাববার কোনো কারণ নেই। আশ্চর্য তোমার কল্পনার দৌড়। একটু থেমে নন্দী বলল, কতক্ষণ এখানে থাকবে তোমার জাহাজ ?

অনেকক্ষণ, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা।

যাক, তোমাকে পেয়ে ভাল হল। পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাতে ধরাতে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নন্দী বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমার স্ত্রী খুব খুশি হবে। চল তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই।

তিনিও কি বাঙালী ?

খাঁটি বাঙালী। তারও বাড়ি কলকাতায়। এখানে আমরা ছাড়া আর কোন বাঙালী নেই। তাই সেখানকার কেউ এলে আমি তাকে জোর করে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। আমার স্ত্রীর রান্নার হাত খুব ভাল। তুমি গিয়ে দেখ কত অল্প সময়ে ভাল দিশি রান্না সে তোমাকে খাওয়াবে।

অনেক দিন দিশি রান্না খাবার অভ্যেস নেই। আর এভাবে যেখানে সেখানে খাওয়া আমি পছন্দ করিনা। হঠাৎ কোন অসুখ হয়ে গেলে হয়তো ঠিক সময় জাহাজ ধরতে পারব না। বেশি টাকা নেই। তাহলে কে দেখবে আমাকে এই বিদেশে বিভূঁয়ে ?

তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। হোকনা নন্দী বাঙালী,

তার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। কে জানে এর সঙ্গে গেলে কোন বিপদে পড়তে হবে কি না।

তাই ইতস্তত করে বললাম, মাপ করবেন। খাওয়া-দাওয়া করবার জন্যে তো এখানে নামিনি। লাঞ্চের সময় জাহাজে ফিরে যাব ঠিক করেছি। এখন শুধু শহর দেখবার ইচ্ছে আছে।

আমার কথা শুনে খুব জোরে নন্দী হেসে উঠল, বিলেত বেড়িয়ে এসে এখানে যে শহর দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করে সে পাগল। কিছু দেখবার নেই এখানে।

বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে একটু চুপ করে থেকে সে বলল, আমি বুঝতে পারছি আমাকে বিশ্বাস করে আমার বাড়িতে যেতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করছ—

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, না না।

আমার কাছে লুকিও না, আমি সব বুঝতে পারি। দেখ, আমি বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়। তোমার দেশের লোক। তাই তোমার কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছে আমার নেই।

আমার গয়ে হাত দিয়ে সে বলল, আর আমি তোমার কি ক্ষতি করব বল? জাহাজ থেকে নেমেছ, তোমার পকেটে নিশ্চয়ই দু-এক পাউণ্ডের বেশি নেই। আমার চেহারা দেখে কি মনে হয় আমি টাকা চুরি করবার লোক?

কী যে বলেন! ওসব কথা আমি ভাবব কেন?

আমার স্ত্রী তার দেশের লোক দেখলে খুব খুশি হয়, নিজে রেঁধে খাইয়ে তাদের যত্ন করে। তাই আমি তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা, আমি নিজে ঠিক সময় তোমাকে জাহাজে তুলে দেব।

আমি অসঙ্কোচে বললাম, চলুন। কতদূর আপনার বাড়ি?

নন্দী বলল, খুব বেশি দূরে নয়। চল আমার সঙ্গে।

সামনের টানা পথ ধরে আমি চলতে লাগলাম। কিছুদূর এসে

বাজারের মধ্যে পড়লাম। সেই সকালে সেখানে ক্রেতাদের কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেছে। এপাশে ওপাশে নানা জিনিসের দোকান। ছেলেমেয়েরা সমানে দরাদরি করছে।

বাজার ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে আমরা একটা সরু গলির সামনে পড়লাম। রাস্তার দুপাশে জীর্ণ পুরনো বাড়ির সারি। তেমন এক বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নন্দী বলল, এবার তেতলায় উঠতে হবে। সেখানেই আমি থাকি।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। ওপরে উঠব কি? যদি কোন বিপদ হয়? যদি আর নিচে নামতে না পারি? কথায় বলে, অজ্ঞাত কুলশীলকে বিশ্বাস করতে নেই। কিন্তু কখন নন্দীর সঙ্গে আমি ওপবে উঠতে লাগলাম বুঝতে পারিনি।

আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নন্দী বলল, এক মিনিট ভাই, কিছু মনে কোরনা। আমার স্ত্রী কাউকে ভাল করে খাওয়াতে না পারলে বড় লজ্জা পায়। তুমি আমার দেশেব লোক, তাই এত সহজে তোমাকে বলতে পারছি। একটু চুপ করে থেকে নন্দী বলল, বেশি নয় যদি একটা পাউণ্ড দাও তাহলে আমি চট করে বাজারটা শেষ করে আসি?

যন্ত্রচালিতের মতো আমি পকেট থেকে এক পাউণ্ডের একটা নোট বের করে দিয়ে বললাম, এই নিন। তারপব মনে মনে বললাম, এমন করে এর সঙ্গে এ জায়গায় আসা আমার কিছুতেই উচিত হয় নি।

টাকা হাতে নিয়ে নন্দী খুশি হয়ে বলল, ধন্যবাদ। তুমি আমার দেশের লোক। কিছু মনে কোরনা ভাই।

আমি উত্তর দেবার আগেই ধাক্কা দিয়ে নন্দী একটা দরজা খুলে বলল, এস, এখানে আমরা থাকি।

তার সঙ্গে ঘরে ঢুকলেও আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কোথায় এলাম। এত অন্ধকার যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। চারপাশ থেকে ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে।

সুইচ টিপে নন্দী আলো জ্বালল।

বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরের অবস্থা দেখে সেখানে আমার খাওয়ার ইচ্ছে নিমেষে উড়ে গেল। অত্যন্ত অপরিষ্কার ঘর। যেখানে সেখানে পুরু ধুলো জমে আছে। ঘরে টেবিল চেয়ার সবই আছে, কিন্তু এত অপরিষ্কার যে তাকালে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করেনা। একটা কার্পেটও সেখানে পাতা আছে দেখলাম।

বস, আমাকে বসতে বলে নন্দী ডাকল, শোভা, ও শোভা—তোমার দেশের লোক এসেছে দেখে যাও।

কিন্তু কেউ আসবার আগে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা ভাই, তুমি কথাবার্তা বল, আমি বাজারটা সেরে আসি। কোন উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে আমাকে সেখানে একা বসিয়ে রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নন্দী চলে গেল।

কেউ কোথাও নেই। পাশের ঘর থেকে ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুধু নিস্তব্ধতা ভাঙছে। আরে মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে জাহাজের বাঁশীর শব্দ ভেসে আসছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমাকে এখানে এই অবস্থায় ফেলে জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, দরজা খুলে বন্দরের দিকে ছুটে যাই।

হঠাৎ খস খস শব্দ হল, চুড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম। চমকে মাথা তুলে তাকালাম। যে এল তার চেহারা দেখে বারবার মনে হল, এ-মুখ আমার অচেনা নয়, কবে যেন একে আমি কোথায় দেখেছি।

তাকে দেখে মনে হয় একদিন অসামান্য রূপ ছিল। আজ চোখের নিচে কালি পড়েছে, দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে, দৃষ্টি হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। আমাকে দেখে সে যেন চমকে উঠল। আমি তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালাম।

কয়েক মিনিট পরে অস্বাভাবিক স্বরে সেই মহিলা আমাকে বলল, কী আশ্চর্য, তোমাকেও নিয়ে এল।

তার কথার মানে বুঝতে না পেরে আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কেন সে একথা আমাকে বলল। তবে কি নন্দী আমাকে যা বলেছে সব কথা মিথ্যা!

আপন মনে বিড় বিড় করে সে আবার বলল, লোকটা কি অন্ধ হয়ে গেল? নাকি সকাল বেলা মাতাল হয়ে রাস্তায় বার হয়েছিল? ···না না কিছুতেই নয়—

আমি চুপ করে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছেন আপনি?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ও কত টাকা নিয়েছে তোমার কাছ থেকে?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এক পাউণ্ড।

তার চোখ জ্বলে উঠল, জান মাঝে মাঝে ওকে আমার খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে। আমার দুর্ভাগ্য, এমন লোকের সঙ্গেও আমাকে বছরের পর বছর থাকতে হচ্ছে। ইচ্ছে হয় সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। জানি না কবে মুক্তি পাব—কথা বলতে বলতে সে চেয়ারে বসে পড়ে আমাকেও বসতে ইসারা করল।

তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, আপনি আমাকে এসব কথা কেন বলছেন?

না বলে থাকতে পারিনা বলে। তুমি ছেলেমানুষ। ও নিজে যত ইচ্ছে নিচে নেমে যাক। আমাকে নামায় কেন?

আপনি কার কথা বলছেন?

যে তোমাকে এখানে নিয়ে এল।

তিনি তো আপনার স্বামী।

আমার কথা শুনে সেই মহিলা কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে বলল, স্বামী! হুঁ! তুমি তাকে খুব অল্পক্ষণের জন্যে দেখেছ। তবু তার চেহারা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। এবার তুমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।

স্বরে অবহেলা প্রকাশ করে সে বলল, অমন একটা লোককে কি আমার স্বামী বলে তোমার মনে হয় ?

আমি কোন কথা বললাম না।

সে আবার বলল, কাউকে বলতে পারিনা। কিন্তু বলবার জন্যে আমার সমস্ত মন প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে। আজও একটি লোকও পাইনি যাকে আমার এসব কথা বলা যায়। তবে আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, সব কথা বলা যায়। যদিও তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট—

তার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হল, এ বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে যেন রহস্য লুকিয়ে আছে। যখন একা জাহাজ থেকে নেমে এখানে এসে পড়েছি তখন রহস্যের সন্ধান আমাকে করতেই হবে। আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

কি কথা বলতে চান আপনি ?

হঠাৎ শক্ত করে করে আমার একটা হাত ধরে সে আমাকে মিনতি করল, তোমার জাহাজে আমাকে নিয়ে যেতে পার ? আমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই—এই তিলে তিলে মৃত্যু আর আমার সহ্য হচ্ছে না—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কেন পালিয়ে যেতে চান আপনি ?

আমার হাত আরও শক্ত করে ধরে সে বলল, তুমি ছেলেমানুষ, হয়তো আমার সব কথা তুমি বুঝতে পারবে না ! একটু চুপ করে থেকে আবার বলল সে, এখানে এভাবে আর বেশিদিন থাকলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। এমন করে বাস করতে হবে জানলে আমি সেদিন কিছুতেই ওর সঙ্গে আসতে রাজি হতাম না—আমি সেদিন বোমার আগুনে পুড়ে মরতাম !

এমনি করে তার কাছ থেকে সব কথা শুনলাম আমি। খুব বেশি অবাক হলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, এমনি কিছু শুনতে হবে

আমাকে। • কথা বলতে বলতে তার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল না কিন্তু। বোধহয় সব জল একেবারে শুকিয়ে গেছে।

শোভা তার নাম। বাবা আসামে কাঠের ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা করেছিলেন। তার মা মারা গিয়েছিলেন ছেলেবেলায়। বাপের আদুরে একমাত্র সন্তান সে। কাজেই কোন অভাব তার ছিল না। যখন শোভার বয়স ঠিক কুড়ি তখন হঠাৎ কোথা থেকে এল ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রচণ্ড ঝড় আর তছনছ করে দিল তাদের সুখের সংসার। প্রবল বেগে শুরু হল যুদ্ধের আক্রমণ। চোখের সামনে থেকে সব আলো যেন মিলিয়ে গেল। শোভা তার বাবার খবর জানে না, সে বলতে পারে না আজও তিনি বেঁচে আছেন কিনা।

এমনি এক প্রচণ্ড আলোড়নের রাত্রে হাঁটা পথে আসাম ছেড়ে চলে আসবার সময় ক্লান্তিতে শোভা এক ফাঁকা জায়গায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। যে যত্ন করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে তার নাম চণ্ডীচরণ নন্দী। কেউ নেই, কোন উপায় নেই, প্রাণেব ভয়ে দিগ্বিদিকে ছুটছে মানুষ। শোভা নন্দীব কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হল। নানা জায়গা ঘুরে নন্দীব অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রায় বাবো বছর আগে সে চলে এল এই এডেনে।

কিন্তু আজ কথা বলতে বলতে তার মনে হচ্ছে, সেদিন বোমার আগুন তার গায়ে লাগেনি বটে, কিন্তু দেহমন ঝলসে গেছে নন্দী নামে লোকটার লোভের আগুনে। সে শুধু নিজে তাকে ভোগ করেনি, নানা লোকের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে বিনা দ্বিধায় তাদের কাছে পাঠিয়েছে ঋণ শোধ করতে। জাহাজ থেকে প্রত্যহ সে কাউকে না কাউকে নিয়ে এসে তাব কাছে ঠেলে দেয়।

তখনও শোভা আমার হাত ছাড়ে নি। এতক্ষণ পর আমি লক্ষ করলাম আস্তে আস্তে তার চোখে জল জমে উঠছে। আমি কিছু বলবার আগে সংক্ষেপে তার ইতিহাস শেষ করে শোভা ভেতরে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পর হাতে একটা নোট নিয়ে ফিরে এসে সে আমাকে বলল, এই নাও তোমার নোট। ব্যস, এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো তুমি চলে যাও—

বাধা দিয়ে বললাম, আমাকে আপনি টাকা দিতে চাচ্ছেন কেন?

কারণ তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে দেখলে আমার—কথা ঘুরিয়ে সে বলল, ও তোমার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছে আমি তা অন্যভাবে শোধ করতে পারব না।

তবুও অবাক হয়ে আমি বললাম, শোধ করবার তো কথা ছিল না।

ছিল বই কি। তুমি এত ছেলেমানুষ যে সেকথা বোঝবার তোমার ক্ষমতা নেই।

বেশ, আমি অপেক্ষা করছি। উনি ফিরে আসুন। ওঁকে জিজ্ঞেস করে সব বুঝে নেব।

কে বলল ও ফিরে আসবে?

উনি নিজে বলেছেন।

কি বলেছে?

বলেছেন বাজার করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। তারপর আপনি রান্না করে আমাকে খাওয়াবেন।

আমার কথার একবর্ণও যেন বুঝতে না পেরে শোভা বলল, তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াব কেন? এসব তুমি কি বলছ? একটু থেমে সে বলল, ও তোমাকে কি বলেছে খুলে বল তো?

আমি দ্বিধা না করে বললাম, বলেছেন, তাঁর স্ত্রী দেশের লোক দেখলে খুব খুশি হন। আমার সঙ্গে গল্প করতে তার ভাল লাগবে। সে দিশি রান্না করে আমাকে খাওয়াবে। ওঁর কাছে টাকা নেই বলে আমার কাছ থেকে এক পাউণ্ড নিয়ে বাজার করতে গেলেন।

আমার কথা শুনে শোভা থেমে থেমে বলল, সে কী! ও তোমাকে এই কথা বলেছে? আশ্চর্য! আর কিছু বলে নি?

আমি তেমনি স্বরে বললাম, না।

লক্ষ করলাম তার দৃষ্টি বদলে যাচ্ছে, মুখ থেকে যত জ্বালা মিলিয়ে যাচ্ছে, শান্ত স্বাভাবিক হয়ে আসছে চেহারা। সে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর উন্মাদিনীর মতো অট্টহাসিতে ঘর ভরে দিয়ে আমাকে বলল, তুমি বস, যেওনা। আমি এখুনি আসছি, আমার হাত খুব জোরে নেড়ে দিয়ে শোভা আবার ভেতর চলে গেল। এবার এক হাতে জলের গ্লাস আর অন্য হাতের নানা রকম খাবারে প্লেট নিয়ে ফিরে এসে সে বলল, নাও, লক্ষ্মী ছেলের মতো এগুলো তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল দেখি—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, এখুনি কেন? উনি ফিরে আসুন।

না না, ব্যস্ত হয়ে শোভা বলল,আমি কিছুতেই তোমাকে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে দেবনা, ফিরে আসতে অনেক দেরি হবে ওর। একবার কী বিপদে পড়েছিল আর একজন। ওর আশায় বসে থাকতে থাকতে জাহাজ ছেড়ে যায় তার—

শোভার কথা শেষ হবার আগেই আমি খাবারের প্লেট সামনে টেনে নিলাম।

আমাকে খেতে দেখে শোভা মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, আমার কথা শুনে তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না?

আমি বললাম, না।

শোভা বেশ জোরে বলল, তোমাকে যা বলেছি সব কথা মিথ্যা। যাকে তুমি দেখেছ সেই আমার স্বামী। আমি কোনদিনও আসামে ছিলাম না, সব বাজে কথা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, অত বাজে কথা আমার কাছে শুধু শুধু বললেন কেন?

আমার অট্টহাসি শুনে সেকথা বুঝতে পার নি?

না। হাসি শুনে কি বুঝব?

যে ওটা পাগলের হাসি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শোভা বলে চলল, আমার মাথায় একটু দোষ আছে। মাঝে মাঝে আমি ক্ষেপে উঠি, আবোল তাবোল বকি। ছেলে মেয়ে নেই কিনা তাই অমন হয়, আমার গায়ে হাত দিয়ে সে বলল, তোমাকে দেখে একটু আগে আমি ক্ষেপে উঠেছিলাম। হয় তো অনেক বাজে কথা বলেছি, সব কথা আমার মনে নেই।

নিজের চেহারা দেখতে পাইনি। কিন্তু শোভার কথা শুনতে শুনতে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল আমার মুখে। আজ এতদিন পর নন্দীর সব অপরাধ ক্ষমা করতে পেরেছে শোভা। অনেক অন্ধকার পেরিয়ে দেখেছে তার নতুন রূপ।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়ে বন্দরের দিকে পা বাড়ালাম। আমি জানি, জ্বালা ক্রোধ ঘৃণা গ্লানি—আমার জন্যে শোভার সব পাগলামি সেরে গেছে। নন্দী ফিরে এলে বোধহয় আজ জীবনে প্রথম সে তার দিকে ক্ষমাসুন্দর চোখে তাকিয়ে দেখবে।

কিন্তু যথাসময় বন্দর ছেড়ে গেল আমার জাহাজ।

১৭ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬
সোমবার সকাল : কলিকাতা।

॥ আকাশ থেকে মাটি ॥

যেমনি ভয়াবহ তেমনি মর্ম্মান্তিক।

কারুর কিছু করবার উপায় নেই। ওদেরও কোন কিছু করবার ছিল না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ যদি মাথার ওপর ছাদ ধসে পড়ে, পথ চলতে চলতে যদি মাটি সরে যায়, যদি আকাশ ভেঙে পড়ে গুঁড়িয়ে দেয় মানুষকে তাহলে কারুর যেমন কিছুই করবার থাকে না, অকস্মাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় মরতে হয়, ওরাও মরেছিল তেমনি করে।

আকাশে নয়, মাটিতেই। কয়েকজন সুদর্শন তরুণ পাইলট।

কালকেই যদিও খবরটা শুনেছিল সারা শহরের লোক তবুও আজ খবরের কাগজের ফলাও খবর দেখে আবার মুখে মুখে আলোচনা শুরু হল। অদ্ভুত। এমন তো কখনও হয় না। কিন্তু কার দোষ বুঝতে পারে না কেউ।

বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ করে। মেঘলা আকাশ। ল্যাণ্ডিং সিগন্যাল ঠিকই ছিল। ভোর পাঁচটা হবে বোধহয়। কিন্তু যেখানে প্লেন নামাবার কথা সেখানে প্লেন নামাতে পারল না বিদেশী পাইলট। নামাল অন্য রানওয়েতে। সেখানে ওড়বার সঙ্কেতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল আর একটা প্লেন।

এমন সময় দুর্ঘটনা।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শোনে দমদমের লোক। ধাক্কা খেয়ে অনেক দূরে ছিটকে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় সেই প্লেন। ভেতরের তরুণ ভারতীয় চালকরাও। তাদের টুকরো টুকরো হাত-পা

বিমানঘাঁটির এখানে ওখানে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। গন্ধ পেয়ে লুব্ধ কুকুরের দল নাকি ছুটে এসে টানাটানি করে সেগুলো। এত কথা অবশ্য খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় নি। দুর্ঘটনার বিবরণটাই বেরিয়েছিল শুধু। আর মৃত পাইলটদের ছবি এবং নাম।

পরমেশ তার এক বন্ধুর কাছ থেকে আরও অনেক বেশি শুনেছিল। সে কাহিনী আরও করুণ। ইলাকে সব কথা বলতে বলতে চোখ সজল হয়ে ওঠে পরমেশের।

কিন্তু ইলা এক অপরিচিত বাঙালী ফ্লাইট লেফটেনেন্টের স্ত্রীর বিমূঢ় অবস্থা কল্পনা করে মাথা ঘামায় কিনা বোঝা যায় না। তবে মন দিয়ে সে পরমেশের সব কথা শোনে না। আপনমনে টুকটাক সংসারের কাজ করে যায়।

পরমেশ বলে যায় বন্ধুর মুখ থেকে শোনা সেই করুণ কাহিনী, বেচারীর কথা একবার ভেবে দেখ ইলা! কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বিনা মেঘে যেন বাজ পড়ল! ভোর রাতে বাড়ি থেকে এরোড্রামে যায় শৈবাল। আরতি কি ভাবতে পেরেছিল আর কয়েক ঘণ্টা পর স্বামীর বীভৎস মৃতদেহ বাড়ি বয়ে দিয়ে যাবে ওরা!

· দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দু-এক মিনিট চুপ করে থাকে পরমেশ। বোধহয় মৃত পাইলট শৈবালের অল্পবয়সী স্ত্রীর দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে আরও বেশি দুঃখ অনুভব করে।

স্বামীর দিকে মাথা তুলে তাকায় না ইলা। কোন প্রশ্ন করে না। কোন কৌতূহল দেখায় না। কেন সে এত বড় ব্যাপারের কোন গুরুত্ব দেয় না সেকথা বুঝতে পারে না পরমেশ। তাই বোধ হয় তার নিজের গলার স্বর আরও করুণ করে তোলে। সব গল্পটাই বলে ইলাকে।

পরমেশ বলে, ওরা বুঝতে পারে নি গাড়ি করে কি আনা হয়েছে। বুড়ি দিদিমা দেখেন প্রথমে। সাদা চাদরে মৃতদেহ ঢাকা ছিল। চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন দিদিমা। তাঁর কান্না

শুনে আরতি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে, অমন করছ কেন দিদিমা? কি হয়েছে?

ওই দেখ বাইরে কি এসেছে। কী সর্বনাশ হল তোর আরতি— দিদিমা অজ্ঞান হয়ে যান।

পরমেশ ওপরে তাকিয়ে বলে, তারপর কি হল জান ইলা?

ইলা মাথা তোলে না। কিছু বলে না। যেমন কাজ করছিল তেমন করেই কাজ করে যায়।

তুমি ভাবতে পারবে না, পরমেশ একটু একটু করে থেমে থেমে বলে, শৈবালের দেহ নিয়ে যাওয়া হবে শ্মশানে। কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে তখন আরতি।

বাড়ির একজন ওকে বলল, ওরে প্রণাম কর।

কিন্তু সেটাই সবচেয়ে দুঃখের, পরমেশ আবার একটু থামে, আরতি প্রণাম করতে গিয়ে পা খুঁজে পায় না শৈবালের। বলে ওঠে, পা কোথায় গেল? দিদিমা, পা ছুঁতে পারছি না কেন?

কে দেবে উত্তর! কে বলবে যে পা আর নেই শৈবালের। টুকরো টুকরো হয়ে এরোড্রামের কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে। হয়তো এখনও সেখানকার কোন কুকুরের মুখে শব্দ করে ওঠা-নামা করছে শৈবালের পায়ের হাড়।

কোন কথা বলে না ইলা। পরমেশের মনে হয় সমস্ত ঘটনাটা এতটুকু রেখাপাত করে না তার মনে। সে অবাক হয়। একটা অদ্ভুত আক্রোশ জাগে ইলার ওপর। কোন ধাতুতে গড়া তার স্ত্রী, সে বুঝতে পারে না ঠিক। অনেক সময় ইলার রূপটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে পরমেশের কাছে। চোখা পাথরের মতো ঠাণ্ডা আর ধারালো রূপ। তাই ছুরির মতো শানিত কথায় স্ত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করে সে।

আমার কথা তুমি শুনছ না মনে হচ্ছে?

ঠাণ্ডা স্বরে ইলা উত্তর দেয়, শুনছি।

মুখ দেখে তো মনে হয় না, কঠিন দৃষ্টিতে ইলার মুখের দিকে তাকিয়ে পরমেশ বলে, মায়া-মমতা কিছু নেই তোমার না ?

জানি না।

চিৎকার করে ওঠে পরমেশ, না নেই। কী আশ্চর্য, এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল অথচ কারুর জন্যে একটুও দুঃখ হল না তোমার! আমি মরে গেলে করবে কি ?

কাজ করতে করতেই ইলা যেন আপন মনে বলে, ওসব প্লেনের গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে না—

প্লেনের গল্প আমি বলছি না তোমাকে। একজন মেয়ের যে সর্বনাশ ঘটে গেল তার কথাই বলছি।

সেকথাও আমি শুনতে চাই না।

তাহলে কি শুনতে চাও ? নিজে কেমন করে আনন্দে স্বার্থপরের মতো জীবন কাটাবে শুধু সেই কথা ? তোমার মতো এমন হীন মনের মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি—

ইলা বাধা দিয়ে বলে, আমাকে যখন ভাল করেই চেন তখন কার কি সর্বনাশ হয়েছে সেকথা শোনাও কেন ? বন্ধু-বান্ধবকে শুনিয়ে চোখের জল ফেলগে যাও। সখের অশ্রু বিসর্জনের সময় আমার নেই।

অবাক হয়ে পরমেশ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। নারীর অনেক রূপের কথা সে বই-এ পড়েছে। ইলাকে তার ডাইনীর মতো ভয়ঙ্কর মনে হয়। যুগ পাল্টালে হবে কি, মানুষের রূপের পরিবর্তন তো আর অত সহজে হয় না। পরিবেশ বদলেছে কিন্তু ইলার মনটা আছে ঠিক তেমনি। কঠিন ভয়ঙ্কর বীভৎস।

পরমেশ সরে যায় তার সামনে থেকে। তাকিয়ে দেখে না ইলা। আর একটা কথাও বলে না।

কিন্তু পরমেশ চলে যেতেই হাত চলে না তার। কাজ করতে মন

চায় না'। চোখে জল চিক চিক করে ওঠে। মাথায় হাত দিয়ে মাটিতেই বসে থাকে ইলা।

একটা কথাই শুধু তার মনে হয়, প্লেন গুঁড়িয়ে গেছে। ঘন মেঘের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কেটে দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া রাজহাঁসের মতো সাদা প্লেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভ্রমর গুঞ্জনের মতো কানে কানে সুদূরের আহ্বান শোনানো আলো জ্বলা পুষ্পক রথ। আর রাতের নিঝুম প্রহরে মাথার ওপর দিয়া মহা সরোবরের ইসারা করে যাওয়া উড়ন্ত মাছের মতো ইলার স্বপ্নের প্লেন।

ভেঙে গেছে। চূর্ণ হয়েছে। এখানে ওখানে কোন চিহ্নও ছড়িয়ে নেই। ভাঙা প্লেনের জন্য ইলা না কাঁদলে কাঁদবে কে। কিন্তু কারুর সামনে নয়। একা। আপন মনে। ঝির ঝির বৃষ্টি ঝরা থমথমে সকালে। অন্ধকারে। কাঁদতে ইলাকে হবেই।

না, তার কান্নার কথা জানবে না একটি লোক। কোন কাগজে বেরুবে না তার এই গোপন প্লেন ক্র্যাশের কথা।

তবু প্লেনের শব্দ শুনলে চমকে উঠবে ইলা। দুই কান চেপে রাখবে সমস্ত শক্তি দিয়ে। যদি কোন রাতে ঘুম ভেঙে যায় আর গুম গুম শব্দ শোনে তাহলে ভ্রমর গুঞ্জন বলে মনে হবে না কোনদিন।

লেক মার্কেটের কাছে তেতলার ছোট একটা ফ্ল্যাট। দুটো ঘর। অবিশ্বাস্য হলেও জানলা দিয়ে এক টুকরো আকাশ দেখা যায়। শরতের সকাল। মেঘলা দিন। যদিও বৃষ্টি পড়ছে রাত থেকে তাহলেও গুমোট গরমে ইলার মুখে কপালে ঘাম জমে ওঠে।

পরমেশ রেগে বেরিয়ে গেছে। কখন ফিরবে কে জানে। হয়তো না খেয়ে অফিসে গিয়ে বন্ধু বান্ধবের কাছে নিন্দে করবে ইলার। আর মনে মনে অভিশাপ দেবে তাকে।

দিক। কোন কিছু ভেবে আর অস্বস্তি বোধ করে না ইলা। মনটা কেমন এক অদ্ভুত রকমের হয়ে গেছে। কিছুতেই মন লাগে না। কোন আব্দার করতে ইচ্ছে হয় না স্বামীর কাছে। আকর্ষণও

নেই কিছুতে। দিন কাটাতে পারলেই হল এড়িয়ে গড়িয়ে। থেকে থেকে মুহূর্তের জন্যে শুধু তার জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে। ক্র্যাশের সময় প্লেন যেমন করে জ্বলে ওঠে তেমন করে।

প্লেনকে তেমন করে জ্বলতে যদিও কখনও দেখেনি ইলা, কিন্তু ও কল্পনা করে নিতে পারে দৃশ্যটা। আর তখনই শুধু চোখে জল জমে ওঠে তার।

কিন্তু সে হল অন্য আর এক প্লেন ক্র্যাশের গল্প। আর তাতে চূড়ান্ত ক্ষতি হয়েছে ইলার একার। সেকথা কাউকে বলতে ইচ্ছেও করে না তার। পরমেশকে তো নয়ই।

অনেকদিন আগে হঠাৎ কিন্তু পরমেশকে বলতে গিয়েছিল ইলা। ক্র্যাশের নয়, অদ্ভুত এক প্লেনের গল্প। একটি কিশোরী মনে দোলা দিয়ে যাওয়া প্লেন—তারপর একটি যুবতীর হৃদয় ভরানো প্লেন। পরমেশ শোনেনি। ইলাকে বলতে দেয়নি সে-গল্প। মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়েছিল।

হেসে উঠে পরমেশ বলেছিল, কোন পাইলটকে দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল বুঝি ?

পাইলট ? অবাক হয়ে ইলা বলেছিল, পাইলটকে দেখে মাথা ঘুরবে কেন ? আমি তখন কাউকেই দেখি নি।

ওকথা বললে শুনব কেন ? আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়ে তুমি, মাথা না ঘুরলেও কারুর সঙ্গে একটু যে ইয়ে-টিয়ে হয়নি সেকথা বললে বিশ্বাস করব না তা আমি তোমাকে বলে দিলাম।

না, কারুর সঙ্গেই কিছু হয়নি আমার, আঘাত খেয়ে মাথাটা যেন দপদপ করছে ইলার।

আহা হা, চটে উঠছ কেন ? রসিকতার সুরে বলেছিল পরমেশ, সত্যি কথা শুনলে অনেক সময় মানুষ চটে যায় বটে, কিন্তু আমার কাছে তোমার লজ্জা কি ইলু ? আমি না তোমার স্বামী ?

আর কথা বলতে পারে নি ইলা। তখন বিয়ের পর প্রথম প্রথম।

কিন্তু আর কোনদিনও প্লেনের গল্প সে বলতে পারেনি পরমেশকে। বলতে চায়ওনি।

যদিও পরমেশ হাসিমুখে মাঝে মাঝে নিজেই খোঁজ করত, কি খবর তোমার পাইলটের? চিঠিপত্র লেখে-টেখে নাকি?

ইলাও হাসত, না, কই আর।

তাহলে মরে-টরে গেছে বোধহয়।

একটু গম্ভীর হয়ে ইলা বলত, হ্যাঁ মরেই গেছে।

কোথায় মরল?

অনেক দূরে—সে-দেশের নামও মনে থাকে না ছাই!

আশ্চর্য, এত বড় খবরটা এতদিন আমাকে দাও নি তুমি?

আমি জানি না। বললাম না, বোধহয় মরে গেছে।

কিন্তু কাগজে নিশ্চয় বেরিয়েছিল খবরটা?

কে আর রোজ কাগজ দেখছে বল!

তা বটে, পরমেশের দৃষ্টিটা হঠাৎ বদলে যায়।

কিন্তু সে সব রসিকতার দিন পার হয়ে গেছে অনেক আগে। এখন অমন সুরে কথাও বলে না পরমেশ, যদি বলবার চেষ্টা করে তাহলে ইলা উত্তর দিতে পারে না তেমন সহজ করে।

আজ সে সব কথাই মনে পড়ছে ইলার। কে ভেবেছিল হাঁসের মতো, মাছের মতো অমন সুন্দর আকাশযানও ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়!

মেয়েটা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। শব্দ হলেই ছুটে আসে। মা ধরে রাখতে পারে না। বাবা হাসতে থাকেন। অনেক ছেলের পর ওই একটি মেয়ে মা বাবা আর দাদাদের আদরে বেড়ে উঠছে।

কিন্তু পার্থিব কিছুতেই আকর্ষণ নেই মেয়ের। তার চোখ আকাশের দিকে। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। এমন একটা কিছুর

দিকে—যা চেনা যায় কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না। দেখা যায় কিন্তু ধরা যায় না। তাই চায় মেয়ে। আকাশের ওই প্লেন এনে দিতে হবে তাকে।

একটা জাপানী খেলনা কিনে আনে এক দাদা, এই নে ইলু, তোর জন্যে এরোপ্লেন এনেছি। এই দেখ, চাবি দিলে কেমন ওড়ে—দাদা চাবি দিয়ে উড়িয়ে দেখায় সেই ছোট্ট জাপানী প্লেন।

ব্যাপার দেখে ইলা খিল খিল করে হাসে। তারপর ওটা তুলে রাখে আলমারীর মাথায়। আর কোনদিনও নামায় না। এমন জিনিস সে তো চায়নি কারুর কাছে।

আলো জ্বলে না এ প্লেনের। আওয়াজ বার হয় না। একটু উড়েই ঝপ করে মাটিতে পড়ে যায়। আকাশের প্লেন আবার মাটিতে পড়ে নাকি কখনও। দূর! কিচ্ছু জানে না দাদাটা।

আর ঠিক সেই সময় বুম বুম বুম বুম শব্দ ভেসে আসে আকাশ থেকে। ইলা দেখে কী সুন্দর আর কত বড় একটা প্লেন! হালকা সাদা মেঘের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। ওটা যদি ইলার হত তাহলে সেও সারাদিন আকাশে আকাশেই খেলা করে বেড়াত। ওই প্লেনটাই চায় ইলা।

বাবা হেসে বলে, পাইলটের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে দেখছি ইলুর—

না বাবা, কখখনও না, আমি কাউকে বিয়ে করব না—আমি এরোপ্লেনকে বিয়ে করব।

হা-হা করে হেসে ওঠেন বাবা, হ্যাঁরে পাগলি, পাইলটরাই তো চালায় প্লেন।

পাইলট কি বাবা, ভগবান?

না, না, তোর আমার মতো মানুষ।

তবে আমি কখখনও মানুষকে বিয়ে করব না --ওই দূরে আকাশে গিয়ে প্লেন ধরব।

আর একটু বড় হল ইলা। এখন ও পাইলটের মানে বোঝে। আকাশের প্লেন ধরে দেবার জন্যেও বায়না ধরে না। কিন্তু পড়তে পড়তে কিম্বা বেড়াতে বেড়াতে সেই চেনা শব্দ পেলে হঠাৎ আনমনা হয়ে যায়।

ভ্রমর গুঞ্জন—সুদূরের স্বপ্ন—পরিধি বেড়ে যায়। ইলা তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ প্লেন দেখা যায় ততক্ষণ।

আরও বড় হল ইলা। তার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অনেক পরিবর্তনও হয়ে গেল। বাবা মারা গেলেন। মার শরীর ভেঙে পড়ল। টাকা পয়সা নিয়ে দাদাদের মধ্যে গোলমাল আরম্ভ হল। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হল ইলা। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে যাবার ভাব।

কিন্তু মন বেড়ে উঠেছে ইলার। সে জানে, এ অস্বস্তি ঘুচে যাবে —এ অন্ধকার দূর হবে—সব অশান্তির অবসান হবে একদিন।

সেই অদেখা অচেনা পাইলট, যে তাকে অনেক মেঘের মধ্যে দিয়ে জ্বলজ্বলে তারার ছায়া খেলিয়ে দিগন্তের কোল ঘেঁষে নিয়ে যাবে তীব্র অনুভূতির কোন মায়াময় সাম্রাজ্যে—তারই অধীর প্রতীক্ষা করে ইলা থমথমে অন্ধকারের মূক জগতে বাস করেও।

ইলার চোখের সামনে আশ্চর্য রুপালী পাখির মতো একটা প্লেন পাখা ঝাপটায় শুধু। তার চুল ওড়ে। শাড়ি শিথিল হয়ে যায়। শরীর অস্বাভাবিক রকম উষ্ণ হয়ে ওঠে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে।

এরোপ্লেনটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ইলাকে। শরীরের ওপর একটা অপূর্ব ভার অনুভব করে সে। কিন্তু তার দম বন্ধ হয় না। আকাশ মেঘ আর তারার গন্ধ লাগে নাকে। ইলার চোখ দুটো হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। আবেশে। শিহরণে। তার শরীর বেয়ে ঘুরে ফেরে সেই আকাশযান মনের অলি-গলিতে উগ্র মধুর ঝাঁজ ছড়িয়ে।

আকাশ থেকে ঘন ঘন সেই প্লেন নেমে আসে ইলার দেহে মনে। অবসাদে। অন্ধকারে। অস্বস্তিকর পরিবেশে। মাছের মতো।

হাঁসের মতো। পাখির মতো। আসবে। শরীর বেয়ে উঠবে। প্রলয় হয়ে গেলেও।

কিন্তু কোন পাইলট এল না শেষ অবধি ইলার সামনে। পাইলটের মতোই এল আর এক জন। বিস্ময় ছড়িয়ে। ঝিকিমিকি তারার আলো জ্বালিয়ে।

শুভদৃষ্টির সময় পরমেশের চোখে দিগন্তের সেই স্বপ্নই তো দেখেছিল ইলা। তার শরীরে আর মনে প্লেনের স্বাদই তো এনে দিয়েছিল পরমেশ প্রথম প্রথম।

আকাশে না ভাসলেও, আকাশ নেমে এসেছিল মাটিতে। তারা-মাছ-হাঁস-প্লেন সব এক হয়ে মিশে যেতে চেয়েছিল পরমেশের মধ্যে এক অদ্ভুত রূপ নিয়ে।

ঠিক চিনতে পারত না ইলা। বুঝতে পারত না। ভেসে চলতে চলতে হঠাৎ যেন একটা বিকট শব্দ হত। বন্ধ হয়ে যেতে ভ্রমরগুঞ্জন। প্লেন থেমে যেত। একরাশ অন্ধকারে কিছু দেখতে পেত না ইলা। কিছু খুঁজে পেত না। পোড়া-পোড়া গন্ধ লাগত নাকে। একটা কিছু পুড়ছে কোথাও। কি—সে জানে না ঠিক। সব যেন গোলমাল হয়ে যায়।

ইলা বলত, কিছু বললে না যে ?

কি ?

কিছু দেখতে পাচ্ছ না ?

না।

তুমি ফুল ভালবাস না বুঝি ?

তখন পরমেশের চোখে পড়ত খোঁপায় নীল রঙের, কতকটা গোলাপের মতো দেখতে একটা ফুল গুঁজেছে ইলা। হয়তো গন্ধও নাকে লাগত পরমেশের।

আরে দেখি দেখি, কোথায় পেলে ?

নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম গীতাদের সঙ্গে—

কথা শেষ হত না ইলার। পরমেশ আদরে আদরে কথা বন্ধ করে দিত তার। ফুলের কথা সেখানেই শেষ। ফুলের গন্ধ মরে যেত সেখানেই। ভয় পেয়ে ফুল ইলার খোঁপা থেকে খসে পড়ত মাটিতে। আলো জ্বলত না তখন।

অন্ধকারে যন্ত্রণায় বিদ্রোহ করতে চাইত ইলার শরীর। আর পোড়া-পোড়া গন্ধ লাগত নাকে। মড়ার মতো পড়ে থাকত সে।

তারপর ক্লান্ত স্বরে পরমেশ জিজ্ঞেস করত হঠাৎ, কত দাম ফুলটার ?

মনে নেই।

যতই হোক, ওসব কিনে পয়সা নষ্ট করে কি লাভ ?

আর কিনব না।

ফল কেনো। খাও। তোমার শরীর ভাল তো নয় খুব। আমাকে তৃপ্তি দেবার জন্যে সব সময় তোমার শরীর তাজা রাখা উচিত—বুঝলে ? হেসে ইলাকে আবার জড়িয়ে ধরত পরমেশ।

সাবধানে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নীরস স্বরে ইলা বলত, রাতের অন্ধকারে অল্পক্ষণ তোমাকে তৃপ্তি দেবার জন্যে ফল কিনে পয়সা নষ্ট করবারও কোন দবকার নেই আমার।

পরমেশ তবু হাসত, কি করব, যা লোকজন আসে দিনের বেলায়। তোমাকে তখন তো একবারেই পাই না।

আলোয় আমাকে তোমার দরকার হয় নাকি কখনও ?

হয় না ? তোমাকে আমার সব সময় দরকার।

অতি কষ্টে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলত ইলা, না। আমাকে তুমি শুধু অন্ধকারেই চাও। তাই ছুটির দিনে সব আলো ঘুচিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে অন্ধকারে আমাকে নিয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে···

আমি যে তোমাকে ভীষণ ভালবাসি ইলা।

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

চল, পরমেশ সুদূরের স্বপ্ন দেখাবার চেষ্টা করত বোধহয়, দুজনে কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।

হাসি পেত ইলার, কি দরকার ?

তোমাকে নিবিড় করে পাব।

এখানে কি পাচ্ছ না ?

পাচ্ছি। তবে মানে—

বাধা দিয়ে ইলা বলত, পয়সা খরচ করে দূর দেশের অন্ধকার কিনে কি হবে ? আমাকে তুমি যেমন করে চাও তেমন করে পেতে কোন অসুবিধা তোমার হয়না তো এখানে।

কিন্তু বিয়ের পর দুজনে মিলে কোথাও যাওয়া হল না। সাধ-আহ্লাদ আছে তো তোমার।

সব মিটে গেছে।

বলা যায় না। কাউকে বোঝানো যায় না। আকাশটা কেমন অচেনা লাগে আজকাল। দূরের প্লেনকে কাছের বলে মনে হয় না। ওটা যেন দূর থেকে দূরে চলে যায়। ইলাকে দেয় না কোন ইঙ্গিত। ইলাও চোখ তুলে তাকায় না আকাশের দিকে। প্লেন দেখবার উৎসাহ অনেক কমে গেছে তার। ভ্রমরের দল তার চেনা পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গেছে। বিপুল পরিধির নীল সবুজ আলো নিভে গেছে দমকা ঝাঁঝালো বাতাসের ঝাপটায়। ইলার মনটা বুড়িয়ে যায় হঠাৎ।

ছুটির দিনে দুপুর বেলা সাধারণত বাড়ি থেকে বার হয় না পরমেশ। ছল-ছুতো করে আজও ইলাকে কাছে ডাকে। অক্লান্ত উৎসাহে আদর করে প্রথমে তারপর ঝিমিয়ে পড়ে।

তখন কথা বার হয় পরমেশের মুখ থেকে। ইলার দোষ ত্রুটির কথা। সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা। কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর মতো কথা বলে পরমেশ।

ইলার কিছু বলবার থাকে না। যদিও সে আকাশ দেখতে পায় না, অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসে তার···মনে হয় দিগন্তে ভয় নেমে আসে। আর আকাশের সাদা মেঘ বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন পথ খুঁজে পায় না ইলার এরোপ্লেন।

তেমন এক দুপুরে সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল ইলার জীবনে। জ্ঞান ছিল না বোধহয় তার! কিছুই মনে নেই।

একটা বিকট আওয়াজ—আর্তনাদ আর এলোমেলো আগুন। ঘুরতে ঘুরতে পুড়তে পুড়তে প্লেনটা পড়ে গেল কোন অন্ধকার জলাভূমিতে কে জানে! বুক চিরে দেখালে হয় তো টুকরো আকাশ আর ভাঙা প্লেনের অংশ চোখে পড়বে কোন অনুসন্ধানীর।

কিন্তু কে জানতে চায় সেই কাহিনীর বিশদ বিবরণ! কেউ না। সে ক্ষতি ইলার একার।

রাস্তায় গান গেয়ে যায় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ভিক্ষে চায় গানের বদলে। ছেলেটির গলা তত ভাল লাগে না ইলার। কিন্তু কী মিষ্টি গলা মেয়েটির! ওদের ডেকে ছুটির দুপুরে গান শোনে ইলা। পরমেশ আপত্তি করে। ইলাকে ছাড়তে চায় না সে মুহূর্তের জন্যেও। কিন্তু তার কথা শোনে না ইলা। জোর করে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ওরা উঠে আসে তেতলার বারান্দায়।

শীতের দুপুর। হালকা শীত। গান শুনতে শুনতে নিস্তেজ আকাশের দিকে মাঝে মাঝে তাকায় ইলা। চিৎকার করে পরমেশকে ডাকে। কিন্তু উঠে আসে না পরমেশ।

গান গায় ওরা দুজনে মিলে, ডাকলে সাড়া পাওয়া যাবেই। আত্মার ডাক বধিরও শুনতে পায়। ওরে ডাক ডাক—প্রাণভরে ডাক।

পর পর দু তিনটে গান গেয়ে পয়সা নিয়ে ইলাকে আশীর্বাদ করে ওরা চলে যায়। ইলা আবার অন্ধকার ঘরে পরমেশের কাছে চলে আসে। মেয়েটির গলা চমৎকার, না?

বিরক্ত হয়ে পরমেশ বলে, ছুটির দিনে আমাকে একা ফেলে সময় নষ্ট কর কেন? সে তাকে গায়ের জোরে কাছে টেনে নেয়, কত দিলে ওদের?

এক টাকা।

পাগল নাকি তুমি? এমন করে কেউ টাকা নষ্ট করে? দু-চার আনা দিলেই তো হত?

ওরা বড় গরিব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে পরমেশ। তারপর বলে, তুমি আমার মনের মতো স্ত্রী নও—আমি চেয়েছিলাম আমার বউ ভীষণ কিপ্টে হবে। এক একটি পয়সা হিসেব করে চলবে। মেয়েদের সেই রকম হওয়াই তো উচিত। তাই নয় কি?

ইলা উত্তর দেয়না পরমেশের কথার। পাশ ফিরে চুপচাপ শুয়ে থাকে তার পাশে। পরমেশ তাকে আদর করে উন্মাদের মতো। আর ঠিক সেই সময় আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনতে পায় ইলা। না, জানলা খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে না সে। প্লেন দেখবার এতটুকু ইচ্ছে নেই তার। কিন্তু সে যন্ত্রণায় ছটফট করে। পরমেশের দৃঢ় বাঁধন আলগা করে পালিয়ে যেতে চায়।

কোথায় পালাবে!

স্তব্ধ মেঘ। মূক আকাশ। দিগন্তে ভয় কাঁপে। জ্বলন্ত আগুনের গোলা ছুটে আসছে। অমন বিকট শব্দ করছে কেন তার প্লেন।

প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা ধরে যায় ইলার। কী উৎকট গন্ধ আগুনের। নাক জ্বলে যায়। দুঃসহ যন্ত্রণায় চোখ দুটো কটকট করে। আর বোধহয় জ্ঞান থাকে না তার।

আগুনে পুড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে হারিয়ে যায় ইলার এরোপ্লেন।

২৭শে জানুয়ারী : ১৯৫৮
সোমবার দুপুর : কলিকাতা।

॥ দেশ মহাদেশ ॥

গ্যাসের আগুন প্রায় নিভে আসছিল।

আস্তে আস্তে উঠে শিবানী একটা শিলিং ফেলল। ঠক করে শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দপ করে জ্বলে উঠল গ্যাসের আগুন। শিবানী আর সোফায় বসল না। আগুনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

এখনও বেলা তিনটে বাজে নি। বাইরে কিন্তু একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। আর একটু পরেই হয়তো ঝির ঝির বরফ পড়তে শুরু হবে। কয়েক দিন থেকে খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়েছে লণ্ডন শহরে। এত শীত নাকি শিগগির পড়ে নি।

প্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে শিবানীর নেই। ম্যাণ্টেলপিসের ধারে দাঁড়িয়ে সে অন্য কথা ভাবছিল, যাদের বাড়িতে এসে উঠেছে তাদের কথা।

বেশ সুখে ছিল এখানে। লণ্ডনের হ্যামারস্মিথ অঞ্চলে ছোট একটি বাড়ি। শান্তির সংসার। শুধু স্বামী-স্ত্রী থাকে এ বাড়িতে। মার্গো আর ক্লার্ক। মার্গোর সঙ্গে এর মধ্যেই বেশ ভাব হয়ে গেছে শিবানীর। তাকে স্পষ্ট করে মনের কথা সে খুব সহজে আজকাল বুঝিয়ে বলতে পারে। মার্গোর সাহায্য পেয়েছিল বলে খুব তাড়াতাড়ি শিবানীর পক্ষে মোটামুটি ভাল ইংরেজী শিখে নেয়া সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু মার্গো আর ক্লার্কের সঙ্গে এ বাড়িতে আর থাকা চলবে না। তাদের সংসার ভেঙ্গে যাবে। দুদিন পর দুজনে চলে যাবে দুদিকে। আর কেউ কারুর খবর রাখবে না।

তাই যত শিগগির হয় শিবানীকেও হ্যামারস্মিথের এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যেতে হবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের কথাও ভাবছিল শিবানী।

যদি বিজনের মতো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে তার বিয়ে না হত তাহলে বিলেতে এসে লেখাপড়া শেখবার কল্পনা শিবানী কোনদিনও করতে পারত না।

সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির মেয়ে সে। তাদের বাড়িতে বিলেতে আসা একটা সংবাদ বৈকি। শিবানী এখানে আসবে শুনে তার বাবা বিজনকে যত আশীর্বাদ করুন না কেন, শিবানী কিন্তু নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে নি। বরং একটা জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে জাহাজে উঠেছিল। সে-পাথর সামান্য নড়াবার ক্ষমতা তার ছিল না, এমন করে নিজেকে বিশ্লেষণ করবার শিক্ষাও হয় তো ছিল না। সেদিন বিনা প্রতিবাদে স্বামীর আদেশ শুধু সে পালন করতে জানত।

কিন্তু আজ দু বছর বিলেতে থেকে, নিতান্ত সামান্য কারণে মার্গো আর ক্লার্কের সংসার ভেঙ্গে যেতে দেখে শিবানীর জগদ্দল পাথরও যেন নড়ে উঠেছে, ইচ্ছে করলে তাকে একেবারে সরিয়ে দিতে পারে সে। তাই কি করবে ভেবে না পেয়ে অন্ধকার ঘরে গ্যাসের আগুনের দিকে শিবানী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

পাটনা থেকে বিজন তার পাঠিয়েছে। পরশু দিন সে লণ্ডনে এসে পৌঁছবে। তারপর দুজনে মিলে কন্টিনেন্টে বেড়াতে যাবার আগে লণ্ডনে কিছুদিন থেকে যাবার ইচ্ছে আছে তার।

কিন্তু বিজন আসবে শুনে একটুও ভয় লাগছে না শিবানীর। কারণ আর ভুল করবে না সে, শিবানীর অজ্ঞতার জন্যে বন্ধু-বান্ধবের সামনে বিজনের আর বোধ হয় লজ্জা পেতে হবে না। বিশুদ্ধ উচ্চারণে চমৎকার ইংরেজী বলতে শিখছে শিবানী। দু বছর পর

তাকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে বিজন নিশ্চয় খুব অবাক হয়ে যাবে।

একটা কথা মনে পড়ল শিবানীর। তাকে বিজন যখন এখানে রেখে যায় তখন কঠিন স্বরে বলেছিল, একদিনও সময় নষ্ট কর না। যেমন করে হোক ভাল ইংরেজী তোমাকে শিখতে হবে। যখন ফিরে যাবে তখন আমাকে আবার যেন অপদস্থ কর না। অনেক টাকা খরচ করতে হল তোমার জন্যে—দেখো আমার পয়সা যেন শুধু শুধু নষ্ট না হয়—

আরও একটা কথা মনে পড়ে শিবানীর। তাকে নিয়ে লণ্ডনে নেমে প্রথম কথা বলেছিল বিজন, ভাবতে পেরেছিলে কোনদিন এখানে আসবে ?

শূন্য চোখে বিজনের দিকে তাকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে শিবানী উত্তর দিয়েছিল, না।

অনেক কিছুই তো সে ভাবতে পারেনি। বিয়ের পর নিজের কিছুই যে অবশিষ্ট থাকে না সেকথাও তার জানা ছিল না। যদি জানত তাহলে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে শুনে তাব গর্ব হত না। অমন করে কাটাত না সে অনেক ঘুমহীন রাত।

নিজের সংসারের সংকীর্ণ পরিবেশ সে নিজেকে ভুলে ছিল। ধরে নিয়েছিল এই নিয়ম। বড়লোক স্বামী হলে এমনি হয়। আর এমনি করেই তাকে কাটাতে হবে সারাজীবন। স্বামীর মঙ্গলের কথা ছাড়া অন্য কথা সে ভাবতে পারবে না। স্বামীর গর্বে গর্ব করতে হবে সব সময়।

প্রতিবাদের কথা কোনদিনও মনে হয়নি শিবানীর। কার কাছে মুখ খুলবে সে ? কে বিশ্বাস করবে তার কথা ? কে মূল্য দেবে তার অভিমানের ? কিসের অভাব তার ? অজস্র মূল্যবান শাড়ি, বিরাট মোটর গাড়ি, কত দামী অলঙ্কার আর বিজনের মতো অমন দুর্লভ স্বামী !

শিবানীর মতো সৌভাগ্য কজন মেয়ের হয়। তার ওপর স্বামী বিলেতে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছে। কোন সাহসে কার কাছে নিজের দৈন্যের কথা সে জানাবে।

দু বছর পর বিজন আসছে শুনে শিবানীর সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। আর বোধহয় সে মুখ বুজে স্বামীর আদেশ পালন করতে পারবে না। এখন সে বুঝতে শিখেছে অমন করে তার জীবন কাটাবার কথা নয়। বিজন তাকে নিতে আসছে জেনে তার মনে ভিড় করে আসছে অনেক পুরনো দিন।

বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে কলকাতা থেকে পাটনায় চলে যায় শিবানী। বিজনের বিরাট মোটর গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার স্টেশনে এসেছিল। ওরা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই সে সেলাম করে সন্তর্পণে দরজা খুলে সরে দাঁড়াল।

ছবির মতো বাংলো বিজনের। মনের আনন্দে চিৎকার করে শিবানীর বলতে ইচ্ছে করল, কী সুন্দর!

কিন্তু সে কোন কথা বলবার আগে উষ্ণস্বরে বিজন বলল, আঃ গেঁইয়া মেয়ের মত একহাত ঘোমটা টেনে কোথায় যাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছনা, আমার অফিসের কত লোক তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে?

ভীতস্বরে শিবানী জিজ্ঞেস করল, কই?

এই যে, একে একে বিজন আলাপ করিয়ে দিল, মিস্টার জার্ডিন, মিস্টার পারেখ, মিস্টার লাডিয়া—

হাসিমুখে শিবানীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তারা বলল, হাউ ডু ইউ ডু—

তাদের কথার উত্তরে কি বলতে হবে বুঝতে না পেরে শিবানী মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

বিরক্ত হয়ে বিজন বলল, তুমিও বল, হাউ ডু ইউ ডু—

তবু কথা বলতে পারল না শিবানী। এত অবাঙালী ভদ্রলোকের সামনে সে লজ্জায় কাঠ হয়ে গেল।

ক্লান্তির অজুহাতে বন্ধুদের সেদিন তাড়াতাড়ি বিদায় করে কর্কশ স্বরে বিজন শিবানীকে বলল, সামান্য ভদ্রতাজ্ঞানও নেই তোমার? অমন বোবার মতো দাঁড়িয়েছিলে কেন? দুটো কথা বলতে পারলে না ওদের সঙ্গে?

বিজনের কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে শিবানী বলল, ইংরেজী বলা আমার অভ্যেস নেই।

ইংরেজীতে তোমাকে কেউ বক্তৃতা দিতে বলছে না। কেউ হাউ ডু ইউ ডু বললে তাকেও তা বলতে হয় সেটুকু ইংরেজী জ্ঞানও কি তোমার নেই?

শিবানী বলল, না।

গলার স্বর আরও তুলে বিজন বলল, তোমার বাবা তাহলে আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন?

কি কথা?

তুমি বি-এ পাশ করেছ—

না বাবা মিথ্যা কথা বলেন নি। আমি ডিগ্রি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, যদি চাও দেখাতে পাবি?

তাহলে মুখ দিয়ে একটু ইংবেজী বেরোয় না কেন?

আমার বাবা ফিরিঙ্গি চালে থাকেন না বলে—

কিন্তু এখানে তোমার বাপের বাড়ির নিয়ম খাটালে চলবে না। তিনি কি জানতেন না কার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন? আমার অফিসের বেশির ভাগ লোক অবাঙালী, তোমার মতো জবুথবু মেয়েকে আমি তাদের সামনে বের করব কেমন করে?

শান্ত স্বরে শিবানী বলল, তুমি যেমন বলবে আমি তেমন করব, তুমি যেমন শেখাবে আমি তেমন শিখব—

বিরক্ত হয়ে বিজন বলল, আমার কাজ নেই, আমি মাস্টারী করি?

আমার ধারণা ছিল তোমার বাবা তোমাকে আমার মতো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারছি আমার ধারণা ভুল—

বিজনকে বাধা দিয়ে মৃদুস্বরে শিবানী বলল, আমি কি করতে পারি বল ?

কি আর করবে ? আমার বন্ধু-বান্ধবের সামনে তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি জাহির করে লোক হাসাও—

বিচলিত হয়ে শিবানী বলল, না আমি লোক হাসাব না। তুমি একটু সাহায্য করলে আমি সব শিখে নেব।

হতাশ হয়ে বিজন বলল, দেখা যাক !

বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে এসে ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে খুব সহজে শিবানী বুঝতে পারল তাকে পেয়ে খুশি হয়নি বিজন। শুধু রূপ দেখে বিয়ে করে সে একেবারে ঠকে গেছে। এমন বউ নিয়ে তার কোন লাভ হবে না। সে না পারবে চাকরিতে উন্নতি করতে, না পারবে বিদেশীদের সঙ্গে ভালভাবে সামাজিক জীবন যাপন করতে। শিবানী তাকে কোন রকমে সাহায্য করতে পারবে না, ঘরের কোণে সঙ সেজে বসে থাকবে শুধু।
তাতে কি লাভ হবে বিজনের ? আর সে বিশ্বাস করে না যে সে যেমন চায় রাতারাতি কেউ তেমন হতে পারে। বাপের বাড়ি থেকে প্রস্তুত না হয়ে এলে কেমন করে ত্বদিনে উচ্চারণ শিখবে শিবানী ? কেমন করে নিখুঁত বিলিতি আদব-কায়দায় আপ্যায়িত করবে বিজনের বন্ধুদের !

তবু বিজন যা-ই মনে করুক, শিবানীর দৃঢ় বিশ্বাস সে যদি সব সময় তাকে ব্যঙ্গ না করে একটু সাহায্য করত, সামান্য সহানুভূতি দেখাত তাহলে বিলেতে আসবার প্রয়োজন হত না, সে দেশে বসেই সব শিখে নিতে পারত। যে বি-এ পাশ করতে পেরেছে তার পক্ষে ওসব আয়ত্ত করা একেবারেই কঠিন নয়।

কিন্তু বিজন সে কথা ভেবে দেখেনি। বার বার বুঝিয়েছে তাকে বিয়ে করে সে ভুল করেছে। বাড়িতে নতুন বউ হয়ে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কটাক্ষ করতে আরম্ভ করেছে। দিনে দিনে সে তার অসন্তোষ আরও বেশি করে প্রকাশ করতে লাগল।

প্রায় তিন মাস পর একদিন অধৈর্য হয়ে বিজন বলল, এমন করে চলবে না, আমি একটা ব্যবস্থা করেছি।

ভয়ে ভয়ে শিবানী বলল, কি ?

তোমাকে বছর দু-একের জন্য বিলেতে রেখে আসব।

চমকে উঠে শিবানী বলল, কেন ?

সে কথাও বুঝতে পাব না ? এখানে থেকে সব কিছু শেখা তোমার মতো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। তাই আমি ঠিক করেছি তোমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দেব। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—

আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করল না বিজন। আর শিবানীব মনে হল, এমন সাংঘাতিক তার অপরাধ যে স্বামী তাকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছে। বুক ঠেলে কান্না এল। মাথার মধ্যে শুরু হল দারুণ যন্ত্রণা, তবু একটি কথাও শিবানী বলতে পারল না।

কাকে বলবে ? আর কি-ই বা বলবে ? স্বামী বিলেতে পাঠাচ্ছে শুনে কাঁদতে ইচ্ছে করছে—একথা শুনে লোকে তাকে পাগল মনে করবে নাকি! তাই জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে শিবানী একদিন বিজনের সংগে নিঃশব্দে জাহাজে উঠল।

লণ্ডনে এসে মার্গো আর ক্লার্কের বাড়িতে অতিথি হয়ে রইল শিবানী। প্রথম প্রথম মানিয়ে নিতে একটু অসুবিধা হত তার, কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে সব ঠিক করে নিল। জেদ ধরল শিবানী। তাকে দুবছরের মধ্যে সব কিছু শিখতে হবে, বিজন যেন আর কোনদিনও তার কোন ত্রুটি ধরতে না পারে।

স্বামী আদেশ না দিলেও নিজের ইচ্ছেয় কলেজে ভর্তি হল সে।

সমাজ বিজ্ঞানের একটা ডিপ্লোমা নিয়ে নিলে ক্ষতি কি! নির্বাসনের প্রত্যেক মুহূর্ত সে কাজে লাগাল। প্রতিদিন ভরে তুলল প্রচুর গ্রহণে আর মনেমনে বলল, সার্থক হোক তার এই নির্বাসন।

এদিকে মার্গোর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল। সে তাকে কটাক্ষ করে না, কঠিন সমালোচনা করে না, প্রচুর যত্ন নিয়ে অসীম স্নেহে তাকে এদেশের রীতি নীতি শেখায়। আর বার বার শিবানীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলে, তোমার কী বুদ্ধি!

খুব ভাব মার্গো আর ক্লার্কের। এত ভাব যে তাদের দিকে তাকিয়ে শিবানী অনেকবার ভেবেছে, স্বামী-স্ত্রী এমন বন্ধুর মতো থাকে কেমন করে। ক্লার্ক স্ত্রীর ত্রুটি ধরে না, মার্গোও স্বামীর কাছে ভয়ে ভয়ে থাকে না। সে আরও লক্ষ করে কেউ কারুর স্বাধীনতায় কখনও হাত দেয় না। মার্গোর অনেক বন্ধু-বান্ধব আসে। ক্লার্ক আপিসে বেরিয়ে গেলে মাঝে মাঝে সেও বেরিয়ে যায়।

ফিরে এসে শিবানীকে বলে, আজ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে অনেক দূর বেড়াতে গিয়েছিলাম।

শিবানী প্রথমে ভাবে মার্গো হয়তো তার কোন মেয়ে বন্ধুর সংগে কোথাও গিয়েছিল। কিন্তু পরে কথায় কথায় জানতে পারে, মেয়ে নয়, ছেলে। তাকে একদিন দেখল শিবানী। বিয়ের আগে থেকে নাকি তার সঙ্গে মার্গোর আলাপ। তার নাম ক্রিস্টোফার।

তারপর হঠাৎ একদিন মার্গোর মুখ থেকে শুনল শিবানী, ক্লার্কের সঙ্গে তার নাকি বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর এ বাড়ি তাকেও ছেড়ে দিতে হবে। ভেতরে ভেতরে এক কাণ্ড চলেছে অথচ আশ্চর্য, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায়নি। কখন এরা গোলমাল করল, কখন বিচ্ছেদের কথা ঠিক করল, কিছুই ভেবে পেলনা শিবানী।

একদিন সে আর কৌতূহল প্রকাশ না করে পারল না। মার্গোকে জিজ্ঞেস করল, কিছু মনে কর না, কেন এমন হল?

যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে মার্গো হাসল, কি আবার হ'ল ? আমরা মানিয়ে থাকতে পারলাম না।

কিন্তু কেন ? এত ভাব তোমাদের ?

কি ভেবে মার্গো বলল, ক্লার্ক বড় স্বার্থপর। সব সময় শুধু নিজের কথা ভাবে। আমারও যে একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে সেকথা ভুলে যায়।

কিন্তু সে তো সব সময় তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে—

হ্যাঁ, ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে মার্গো বলল, যতক্ষণ সে বোঝে আমি তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি ততক্ষণ সে খুশি থাকে। কিন্তু আমার অন্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমি যখন দেখা করতে যাই তখন সে খুশি হয় না।

শিবানী আস্তে আস্তে বলল, দেখা না করলেই তো পার।

তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মার্গো বলল, আমি সেকথা ভাবতে পারি না। কেন দেখা করব না ?

স্বামীকে ভালবাসলে, সে যা চায় না তা করবার দরকার কি ?

আমার ছোটখাট ভাল লাগাকে স্বামী প্রশ্রয়ই বা দেবে না কেন ? একটু থেমে মার্গো বলল, আর কেউ যদি আমার স্বামীর চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসে, স্বামীর আদেশে তাকে হঠাৎ একেবারে অস্বীকার করবার মতো শিক্ষা আমার নয়, শিবানীকে চুপ করে থাকতে দেখে মার্গো আরও বলল, মনের সম্পর্কে যেখানে সন্দেহ জেগেছে সেখানে এক মুহূর্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা ইংরেজ, কোন ফাঁকি সহ্য করতে পারি না। আমরা ব্যক্তিত্বের মূল্য সব চেয়ে আগে দিই, যে দিতে পারে না তার ওপর কোন শ্রদ্ধা থাকে না আমাদের।

চুপ করে রইল শিবানী।

যথাসময় বিজন এসে হ্যামারস্মিথে মার্গো আর ক্লার্কের ফ্ল্যাটে উঠল। শিবানীকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে সে একেবারে

অবাক হয়ে গেল। এত ভাল ভাবে এখানকার সব কিছু শিবানী যে আয়ত্ত করতে পারবে বিজন তা ভাবতে পারেনি।

তাই কয়েকদিন পর উচ্ছ্বসিত হয়ে সে স্ত্রীকে বলল, কনগ্রাচুলেশনস ! তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি শিবানী। তুমি একেবারে বদলে গেছ, একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছ—

বিজনের কথা শুনে খুব আস্তে শিবানী বলল, হ্যাঁ।

শিবানীর আরও কাছে সরে এসে বিজন বলল, যাক আর ভাবনা নেই, তোমাকে দেখলে এবার অফিসারদের তাক লেগে যাবে। এবার আমার উন্নতি ঠেকায় কে ?

শিবানী জিজ্ঞেস করল, আর তোমার তাক লাগেনি ?

লাগেনি ? আমি ভাবতেই পারিনি তোমার মতো মেয়ে এমন করে নিখুঁত আদব-কায়দা শিখে নেবে।

শাণিত হাসি হেসে শিবানী বলল, দেখলে তো এসব জিনিস শেখা কত সহজ? সুযোগ-সুবিধা পেলে এসব শিখতে মানুষের দেরি লাগে না।

বিজন বলল, তাই তো তোমাকে এখানে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যে সত্যি এমন হয়ে উঠবে তা ভাবতে পারিনি !

অনেক কিছু অনেক সময় মানুষ ভাবতে পারে না। আমিও ভাবতে পারিনি শুধু নিজের সুবিধার জন্যে তুমি আমাকে এমন করে নির্বাসন দণ্ড দেবে।

বিস্মিত হয়ে বিজন বলল, নির্বাসন দণ্ড ?

হ্যাঁ, কিন্তু সে কথা থাক, শিবানী গম্ভীর স্বরে বলল, শুনেছ বোধহয় মার্গো আর ক্লার্কের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, তুমি আসবে বলে ওরা এখনও এ বাড়িতে আছে—

হ্যাঁ আমি সব শুনেছি।

কাজেই কোথায় থাকবে ঠিক করেছ ?

বিজন হেসে বলল, লণ্ডন শহরে থাকবার ভাবনা কি ? কাল একটা ভাল হোটেলে উঠে গেলেই হবে।

তুমি তাহলে তাই যেও, বিজনের দিকে তাকিয়ে নীরস স্বরে শিবানী বলল, কার্টরাইট গার্ডেনস-এ মেয়েদের হস্টেলে আমি আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি, কথা শেষ করে সে বেশ দূরে সরে বসল।

শিবানীর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বিজন বলল, তুমি আলাদা থাকবে কেন? হোটেলে ডবল ঘর পাবার কোন অসুবিধা হবে না এখন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও শুষ্ক স্বরে শিবনী বলল, আমি যদি বলি, তোমার সঙ্গে থাকবার কথা আমি আর ভাবতে পারি না, তোমার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক থাকবে না, তুমি পাটনয়ে ফিরে যাও, আমি আর ফিরব না, ফিরলেও তোমার স্ত্রী হয়ে তোমার বাড়িতে আর উঠব না। আমি এখানেই চাকরি করব?

শিবানীর মুখ থেকে এক সঙ্গে এত কথা শুনে বিচলিত হয়ে বিজন বলল, পাগলের মতো এসব তুমি কি বলছ শিবানী? কি হল তোমার হঠাৎ?

তেমনি কঠিন স্বরে শিবানী উত্তর দিল, তুমি যা ভাবতে পারনি তাই হয়েছে অর্থাৎ আমার আশ্চর্য পরিবর্তন। শুধু আমি ইংরেজী আদব-কায়দা শিখে অন্য মানুষ হইনি, যে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয়না তাকে অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। তোমার ওপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।

কিন্তু কেন? কে বলে আমি মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিই না?

দাও নাকি? বিদ্রূপের হাসি হেসে শিবানী বলল, তোমার স্ত্রী হয়ে আমি কিন্তু একদিনের জন্যেও তার প্রমাণ পাইনি। আমাকে কোন মর্যাদা তুমি কখনও দাওনি, কোন দিন ভাবনি যে আমি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ।

এসব কথা তুমি আমাকে কেন বলছ?

কারণ আজ বলবার সময় এসেছে, নিখুঁত ইংরেজীতে শিবানী বলল, ডেমক্র্যাটিক দেশে দু বছর বাস করলাম কিনা তাই তুমি যদি

আমাকে দিয়ে শুধু কাজ উদ্ধার করিয়ে নিতে চাও তাহলে আমি কিছুতেই তা সহ্য করব না।

বিজন বলল, আমি তোমাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করিয়ে নিতে চাইব কেন ?

শিবানীর চোখ জ্বলে উঠল, তা ছাড়া কি চাও তুমি আমাকে দিয়ে ? কোনদিন আমার মনের কথা তুমি ভেবে দেখেছ। প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে পাটনায় যাই সেদিন থেকে আজ অবধি তুমি শুধু ভেবেছ তোমার আপিসের লোক কি করলে আমকে দেখে খুশি হবে আর তুমি নিজে কেমন করে উন্নতি করবে। বিলেতে পাঠাবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলে সংসার ছেড়ে বিদেশে একা থাকতে আমার কষ্ট হবে কি না ?

এক মিনিট থেমে দম নিয়ে শিবানী আবার বলল, এবারে এসেও আমাকে জিজ্ঞেস করলে না আমি কেমন আছি, আমি কেমন ছিলাম—কেবলই নিজের স্বার্থের কথা ভাবছ, কখন দেশে ফিরে তোমার আপিসের বন্ধুদের মাঝে আমাকে খাড়া করিয়ে নিজে বাহাদুরী নেবে ?

শূন্য দৃষ্টিতে শিবানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বিজন জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করতে চাও শিবানী ?

এখানে চাকরি করতে চাই। তোমার সঙ্গে সব সম্পর্কের শেষ করতে চাই।

কিন্তু আমি কি করব ? পাটনার সব লোক জানে আমি ছুটি নিয়ে তোমাকে নিতে এসেছি। এখন তুমি যদি সঙ্গে না যাও তাহলে কোন মুখে আমি একা ফিরে যাব ? তুমি আমাকে এমন করে লজ্জায় ফেল না।

তুমি আমাকে লজ্জায় ফেল নি ? ইংরেজী বলতে পারিনি বলে তোমার বন্ধুদের সামনে, কাঁটা-চামচের ব্যবহার শিখিনি বলে চাকর-বাকরের সামনে তুমি আমাকে অসংখ্যবার অপমান কর নি ?

বিজন আস্তে বলল, হ্যাঁ করেছিলাম।

তাহলে কেন আমি আজ চুপ করে থাকব? তুমি টাকা খরচ করে আমাকে এখানে বিলিতি কালচার গ্রহণ করতে পাঠিয়েছ। হ্যাঁ, সার্থক হয়েছে তোমার অর্থব্যয়, আমি এদেশের রীতি নীতি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পেরেছি। তাই ব্যক্তিত্বের অবমাননা আর সইব না। শুনেছ তো কি কারণে মার্গো আর ক্লার্কের ডিভোর্স হয়ে যাবে!

ব্যাকুল হয়ে বিজন বলল, না, না, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না সে কথা আমি ভাবতে পারি না শিবানী। তুমি না গেলে আমি কিছুতেই একা পাটনায় ফিরে যেতে পারব না—

হেসে শিবানী বলল, এখনও তুমি তোমার সমাজের কথা ভাবছ। এবেলা তো ইংরেজ মনোভাবাপন্ন হতে পার নি। কেন তুমি লোককে বলতে পারবে না, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনলনা বলে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

না আমি কিছুতেই সেকথা বলতে পারব না।

আবার হেসে শিবানী বলল, মনে-প্রাণে তাহলে খাঁটি বাঙালী রয়ে গেছে দেখছি।

আমার ভুল হয়েছিল, শিবানীর একটা হাত ধরে বিজন বলল, আমি অন্যায় করেছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর—

কেমন সুরে কথা বলছ তুমি? বিজনের হাত সরিয়ে দিয়ে শিবানী বলল, এটা ইংল্যাণ্ড, এখানে ছেলেরা এমন ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে না—

আমি সব বুঝেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ওপর আমি আর কোন অন্যায় কখনও করব না, আমার সঙ্গে তুমি ফিরে চল শিবানী?

আর কোন অন্যায় করবার সুযোগ তুমি পাবে না। কারণ আদব-কায়দায় আর আমার ভুল হবে না। তাই এবার অযোগ্য মনে করে যদি তোমাকে আমি নির্বাসনে পাঠাই?

বিজন বলল, আমি যাব।

তাহলে তুমি একা ফিরে যাও। আরও দু বছর পর ফিরে এস। সত্যি তখন যদি তুমি মনের দিক থেকে আমার যোগ্য হও তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যাব—

বিজন টেনে টেনে বলল, দু—ব—ছ—র!

তার চেয়ে বেশিদিন আমি নিজে কী অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি তুমি তা বুঝতে পারবে না। তোমার সাধনায় যদি আমার সব অপমান মুছে যায় তাহলেই আমি আবার তোমার সঙ্গে যাব, নাহলে কিছুতেই নয়।

শিবানীর দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে বিজন আর কিছু বলতে পারল না। ওদিকে গ্যাসের আগুন আবার নিভে এসেছে কিন্তু উঠে গিয়ে শিলিং ফেলতে ইচ্ছে হল না শিবানীর।

১১ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬

মঙ্গলবার সকাল : কলিকাতা

॥ শুভ কামনা ॥

শেষ অবধি শিশিরকেই বিয়ে করে বসল আরতি। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবল না। কারুর কথা চিন্তা করল না। স্বার্থপরতার চরম প্রমাণ দিল বাপ-মায়ের কাছে।

আত্মীয় মহলে বেশ কিছুদিন থেকে কাণাঘুষো শুনছিলেন নিরুপমা। বিশ্বাস করেন নি। মেয়েকে সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস পান নি। আরতি যদি ক্ষেপে ওঠে। অর্থাৎ সে ভাবতে পাবে তার মতো মেয়েব সম্পর্কে নিরুপমা এমন অদ্ভুত কথা ভাবেন কেমন করে।

নিরুপমা রীতিমত মুশকিলেই পড়েছিলেন প্রথম প্রথম। আব যতই মুখ বুজে থাকেন, এখান ওখান থেকে ততই শোনেন আবতি আর শিশির সম্পর্কে অনেক রকম।

ওবা নাকি ছবি দেখতে যায় এক সঙ্গে প্রায়ই। রেস্তোরাঁয় এটা ওটা খায়। আর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো তো আছেই। আরতির সঙ্গে দেখা কবতে এ বাড়িতেও কয়েকবার এসেছে শিশির।

কিন্তু এসব কথা তুলে কিছু বলা যায় না আরতিকে। তার বয়স হয়েছে। এ বছর এম, এ, পাশ করে চাকরি নিয়েছে একটা সরকারী কলেজে। শিশিরও কয়েক বছর হল পড়াচ্ছে সেখানে। আলাপ, আসা-যাওয়া একটু একটু তো হবেই। বলবেন কি মেয়েকে নিরুপমা। বলবার কিছু আছে নাকি।

শিশিরের চেহারাটা ভাল লাগেনি নিরুপমার। লোকটাকেও নয়। আরতির সঙ্গে অত অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলবার ধরনটাও

নিরুপমার ভাল লাগে নি। এই তো সেদিন চাকরি করতে গেল আরতি। এর মধ্যেই ওই অধ্যাপকের সঙ্গে অত ভাব হল কেমন করে এই কচি মেয়েটার। শিশিরই কৌশল করে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে বোধ হয় তাঁর মেয়েকে। যা দিন কাল। শহরে বাস করতে গেলে কখন কি ঘটে যায় সংসারে কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু সেই দিনই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন নিরুপমা তাঁর মেয়ের সম্পর্কে। ভাগ্যিস তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন নি তিনি মেয়ের কাছে। সর্বনাশ হত তাহলে। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করত আরতি।

শিশির চলে যেতেই মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন নিরুপমা, এত বয়স হল, এখনও বিয়ে করে নি যে তোদের শিশিরবাবু ?

বিয়ে করবেন না কেন ? কবে বিয়ে করেছেন !

স্ত্রী এল না যে ?

আমি তাকে চিনি না।

শিশিরের বিয়ে হয়ে গেছে শুনে নিরুপমার সন্দেহ দূর হয়ে যায়। আরতির দিক থেকে জড়িয়ে পড়বার আর কোন আশঙ্কা নেই।

কাউকে অকারণে সন্দেহ করা স্বভাব নয় নিরুপমার। তাঁর নিজের মেয়েকে তো নয়ই। কিন্তু প্রথম দিন শিশিরকে দেখে তাঁর দৃষ্টিটা একটু বাঁকা হয়ে উঠেছিল কেন, তার কারণ আজ খুঁজে পান নিরুপমা।

দৈবের নির্দেশ মেনে যদি তিনি কঠোর হতেন তাহলে সব দিক রক্ষা হত। মেয়েকে তিনি রক্ষা করতে পারতেন। একটা লোক ধূমকেতুর মতো হঠাৎ এসে কিছুতেই তোলপাড় করে তুলতে পারত না তাঁদের পরিবার।

মিথ্যা কথা বলেনি আরতি। কিন্তু কিছুটা গোপন রেখেছিল। তখন সে নিজেই জানত কিনা কে জানে। সেই শিশিরেরই ব্যক্তিগত ইতিহাস। নিরুপমার সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়।

বিয়ে হয়েছিল শিশিরের ঠিকই। কিন্তু আরতি নিরুপমাকে বলেনি যে বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল। আর নিরুপমা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে শুধু একজনের দোষে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়ে যায়। দোষ দু পক্ষেরই থাকে। কারুর কম কারুর বেশি। শিশির নিজেকে যতই সাধু বলে প্রচার করুক আরতির কাছে, নিরুপমার দৃঢ় বিশ্বাস একেবারে নির্দোষ মানুষ সে নয়।

নিরুপমা হঠাৎ বথা তোলেন, নানা জায়গা থেকে শুনছি শিশিরের স্বভাব চরিত্র নাকি ভাল নয়?

একটু অবাক হয়ে আরতি বলে, তাই নাকি? কই আমি তো কিছু শুনিনি—

যাক গে, বেশি মেশামেশি করিস না ওর সঙ্গে।

কেন? আরতির গলার স্বরটা উষ্ণ হয়ে ওঠে, তুমি আজে বাজে লোকের কাছ থেকে কি সব যা-তা শুনেছ বলে? একটু চুপ করে থেকে আরতি বলে, একটা কথা জেনে রাখ মা, আমি তাঁর মতো ভদ্রলোক খুব কমই দেখেছি—

বাধা দিয়ে নিরুপমা বলেন, মানুষ চেনা অত সোজা নয়।

আরতিও বলে, কিন্তু শিশিরবাবুকে চিনতে দেরি লাগে না মানুষের।

তুই তো সব বুঝিস।

সব না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝি। বোকারা তাঁর অতীত নিয়ে মাথা ঘামায়। তাঁর অতীতের কথাও আমি সব জানি। সেকথা শুনে শিশিরবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগে না মানুষের!

এত কথা তোদের হয় কখন? ভয়ে ভয়ে নিরুপমা তাকিয়ে থাকেন আরতির দিকে।

আরতি হেসে বলে, বা রে, একসঙ্গে কাজ করি, কথা হবে না? আরও অনেকে তো কাজ করে তোর সঙ্গে। কই, তাদের তো কখনও দেখি না?

সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নাকি ? আর যারা আছে তারা বড় বোকা। কারুর সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগে না।

মুখে আর কিছু বলেন না বটে নিরুপমা কিন্তু মনে মনে একটা তীব্র অস্বস্তি অনুভব করেন। আরতিকেই তাঁর যত ভয়। বাপের আদরে আদরে ছেলেবেলা থেকেই মেয়েটা অদ্ভুত রকমের জেদী হয়ে উঠেছে। কাউকে গ্রাহ্য করে না। পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের বিচার নিজেই করে নেয়।

নিরুপমার যত রাগ হঠাৎ গিয়ে পড়ে আরতির বাপের ওপর। লোকটা যেন চোখ কান বুজেই থাকে সারাদিন। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটতে চলেছে সংসারে অথচ চারুবাবু একেবারে নির্বিকার।

কাণ্ড একটা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা বৈকি প্রচুর। যা রটে তার কিছুতো বটে। শুধু শুধু আত্মীয়রা দুর্নাম রটাতে যাবে কেন আরতির নামে। অথচ কে খবর রাখে কী সাংঘাতিক সর্বনাশ নেমে আসছে সংসারে। মেয়েটাকে চারুবাবু মুখের ওপর কিছু বললে হয় তো কাজ হয় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সে-সাহস আছে নাকি লোকটার। নিজেই তো আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন। এখন ওই মেয়েকে নিয়ে নিরুপমাকে ভুগতে হবে সারাজীবন। একটা বিবাহিত অধ্যাপককে জামাই বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না নিরুপমা।

অবশ্য অনেক আগে থেকেই তিনি জানতেন এমন একটা কিছু ঘটবে। মেয়েদের বেশিদূর লেখাপড়া শেখালেই এমন হয়। কলেজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আরতির বিয়ে দিয়ে দিলে আজ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পারতেন নিরুপমা। এমন অশান্তি দেবার সুযোগ পেত না আরতি। কিন্তু ওর বাপই সব অশান্তির মূল। জোর করে মেয়েকে কলেজে ভর্তি করলেন তিনি। নিরুপমা বারণ করায় হেসে উঠে বলেছিলেন, আজকাল এত কম বয়সে মেয়ের বিয়ে কেউ দেয় না। দিলে গলায় পাথর বেঁধে মেয়েকে নাকি জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। দেশের যা অবস্থা, কখন মানুষের জীবনে কি সর্বনাশ নেমে আসে বলা যায় না।

তাই মেয়েকে যথেষ্ট শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করে রাখাই উচিত।

এমন অদ্ভুত কথা কেউ শুনেছে নাকি কখনও। মেয়ের বিয়ের আগে কোন বাপ এমন কথা ভাবে। তারপর বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে নিজেই ভাববে বৈকি নিজের ভাবনা। তখন কেন শুনবে বাপ-মায়ের কথা। কেনই বা মানবে তাদের মতামত।

হলও ঠিক তাই। ভাল করে বি-এ পাশ করবার পর আরতি জেদ ধরল এম-এ পড়বে। সকলে বলছে সে নাকি আরও ভাল করবে এম, এ, পরীক্ষায়।

তেমন কোন পাত্র যখন হাতের কাছে নেই সেই মুহূর্তে তখন কি আর করেন চারুবাবু। আরতিকে চুপচাপ বাড়িতে বসিয়ে রাখলে শুনবে নাকি কথা সে। তাই রাজি হতেই হল আরও বেশিদূর পড়াশুনো করতে দেবার ব্যাপারে।

যদিও নিরুপমা তখন মেয়েকে বাড়িতে বসিয়ে রান্না-বান্না আর সংসারের আরও নানা রকম কাজ শেখাতে চেয়েছিলেন। এমনিতেই বয়সের তুলনায় অনেক কম জানে মেয়ে। নিরুপমার মনে হয়, সব চেয়ে আগে সংসারের কাজ শিখিয়ে মেয়েকে প্রস্তুত করে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো দরকার। তা না, যত আজেবাজে ভাবনা চারুবাবুর।

একটা পান মুখে দিয়ে খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করছিলেন চারুবাবু। এমন সময় আস্তে আস্তে নিরুপমা সে-ঘরে এসে দাঁড়ান। শীতকাল। কিন্তু জোর নেই শীতের। একটা মাস যেন সকলকে ফাঁকি দিয়ে চুপে চুপে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। মাঘ মাসের প্রথমে মনে হয় ফাল্গুনের প্রথম। বসন্তের হাওয়া দিয়েছে বেশ জোরেই।

মনের যত জ্বালা উজাড় করে একসুরে বকে যান নিরুপমা, কিছুই দেখবে না সংসারের—কিছুই ভাববে না। আমি মরে গেলেও খবর রাখবে না তুমি—

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে চারুবাবু হেসে জিজ্ঞেস করেন, কি হল? হঠাৎ এমন মেজাজ বিগড়ে গেল কেন তোমার নিরু?

তুমি তো আমার চড়া মেজাজই দেখে আসছ চিরদিন। ওদিকে মেয়েটা যে একটা বদমাইসের কবলে পড়ে খাবি খাচ্ছে সে-খবর রাখ?

চারুবাবু চমকে উঠে প্রশ্ন করেন, সে কি!

এমন বাপ চোদ্দ জন্মে দেখিনি বাপু। শুনছি একটা বদমাইসের সঙ্গে আরতি ঘোরাফেরা করছে খুব আজকাল। লোকটার স্ত্রী আছে। স্ত্রীকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে লোকটা।

চারুবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, কে লোক?

ওই যে সেই প্রফেসারটা।

মুখ দেখে মনে হয় কথাটা বুঝতে বেশ দেরি লাগছে চারুবাবুর। কিন্তু একটু পরে তিনি হো হো করে হেসে ওঠেন, তুমি শিশিরের কথা বলছ? ছি ছি, এমন ভাষায় ওর সম্বন্ধে কথা বল না। আরতি শুনতে পেলে দুঃখ পাবে। আমাদের ওপর শ্রদ্ধা হারাবে।

কিন্তু কি করে বেড়াচ্ছে ওরা আজকাল জান?

জানি। আরতি থিসিস লিখছে তাই শিশির তাকে সাহায্য করছে।

তুমি কেমন করে জানলে?

আরতি বলছে আমাকে।

কিন্তু লোকে যে যা-তা বলছে ওদের সম্পর্কে। কুমারী মেয়ের এমন দুর্নাম রটা কি ভাল?

আজে-বাজে লোকের কথায় কান দিও না। মন্দ লোক চিরদিন মন্দ কথা বলে থাকে। আরতি আমার সোনার মেয়ে। ও কখনও এমন অদ্ভুত কাজ করে আমাদের অপদস্থ করতে পারে না।

একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিরুপমা বলেন, ভিন্ন জাত বলে আমি তত মাথা

ঘামাচ্ছি না—কিন্তু একবার বিয়ে হয়ে গেছে শিশিরের—

আবার হাসেন চারুবাবু, হোক না। কিন্তু তাকে আরতি হয় তো শ্রদ্ধা করে, বিয়ে করবার কথা সে ভাবতে পারবে না তা তুমি আমার কাছ থেকে জেনে নাও, বেশ জোর দিয়ে কথা বলেন চারুবাবু, আমার মেয়েকে আমি চিনি না?

স্বামীর কথা শুনে যদিও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না নিরুপমা তবুও একটু ভরসা পান যেন। স্বামীর ওপর রাগটা কিন্তু একেবারে চলে যায় না তাঁর। মানুষটা সত্যি চিরদিনই আশ্চর্য রকম নির্বিকার।

ভয় কম্পন উত্তেজনা আর যত রাজ্যের লজ্জা বয়ে আনল হঠাৎ আরতির সেই ছোট চিঠি। কোথায় কি একটা কাজ আছে বলে সকালে বেরিয়েছিল আরতি। আরও ভাল একটা চাকরির চেষ্টা করছে নাকি, তাই মা বাবাকে প্রণাম করেছিল যথারীতি। একটা ভাল কাপড় নেয় নি, বাপ-মায়ের দেওয়া গয়নাও নেয়নি একটিও। সাধারণ একটা শাড়ি পরে বেরিয়ে গিয়েছিল আরতি।

সে আর বাড়ি ফিরে এল না। বেলা এগারোটার সময় তার লেখা একটা চিঠি নিয়ে এল বোধ হয় শিশিরের কোন আত্মীয়। খামের ওপর নিরুপমার নাম লেখা রয়েছে।

ভীতু মেয়ে! লেখাপড়া শেখানোর ফল ফলল ভাল করে। সত্যি কথা স্বীকার করবার সাহস হয়নি আগে। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে শিখেছে শুধু। এতবড় স্বার্থপর মেয়ে আর কোথাও কখনও দেখেননি নিরুপমা।

দুম দুম করে পা ফেলে স্বামীর ঘরে এসে সুখবর দিলেন নিরুপমা, হল এবার! তোমার মেয়েকে তুমি ভাল করে চেন না? এই নাও চিঠি—চারুবাবুর মুখের ওপর চিঠিটা প্রায় ছুঁড়ে দিলেন নিরুপমা।

কি হয়েছে? ভাঙা গলার স্বর চারুবাবুর, কি করেছে খুকি?

করবে আর কি, আমাদের মুখে চুণ কালি মাখিয়ে সরে পড়েছে—

তার মানে? অবাক হয়ে যান চারুবাবু।

মুখ বিকৃত করে গলার স্বর তোলেন নিরুপমা, সেই বদমাইস প্রফেসারটাকে আজ সকালে তোমার মেয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। হল? রিসার্চ করবার মানে বুঝলে তো এবার—

নিরুপমার কথা শুনে চারুবাবুর চেহারাটা যেন বদলে গেল, না না, অসম্ভব। এ হতেই পারে না। আমাকে না জানিয়ে খুকি কখনও এমন কাজ করতে পারে না। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না নিরু—চারুবাবু নিচু হয়ে মাটি থেকে চিঠিটা তুলে নিতে যান।

কিন্তু ক্ষিপ্র গতিতে নিরুপমাই তুলে নেন সেটা। তারপর স্বামীকে শুনিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করেন—

সুখ ও দুঃখ মিশিয়া আমার জীবনে আজ যে প্রভাত আসিয়াছে তাহার কথা তোমাদের পূর্বে জানাইতে পারি নাই বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিও। আমি ইচ্ছা করিয়া আমার দুঃখকে প্রবল করিয়া তুলিতে চাই নাই। আমি আজ তোমাদের অনুমতি না লইয়াই শিশিরকে বিবাহ করিয়াছি।

সর্বান্তকরণে তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করিতে পারিবে কিনা জানি না কিন্তু আমি নিজে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে আমি সুখী হইলে, আমার সুখ দেখিয়া তোমরা সুখী হইবে।

এই সূত্রে একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না যে লোক মুখে নানা কথা শুনিয়া তোমরা তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছ। যাহারা তাহার নামে কুৎসা রটনা করে তাহারা তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াছে, কাছে আসিয়া চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ পায় নাই। আমি পাইয়াছি। পাইয়াছি বলিয়াই তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি।

আজ তোমরা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে পরে যে ক্ষমা করিতে পারিবে তাহা জানি। আর জানি বলিয়াই, তোমরা উপস্থিত

না থাকিলেও, তোমাদের আশীর্বাদ লাভে আমরা বঞ্চিত হইব না। তোমরা আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম—

চিঠিটা শেষ করতে পারেন না নিরুপমা। চোখের জলে অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে যায়। শাড়ির আঁচলে চোখ মোছেন তিনি।

কিন্তু ওকি! অমন করছেন কেন চারুবাবু। শরীরের সব রক্ত যেন মুখে এসে জমা হয়েছে। কাঁপছেন থরথর করে। খাটের ওপর বসে পড়েন তিনি কেমন অদ্ভুত ভাবে কাৎ হয়ে।

স্বামীর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে যান নিরুপমা, ওগো তুমি অমন করছ কেন? রাক্ষুসী মেয়ে কী সর্বনাশ করে গেল আমার! ওগো—ওগো—

থেমে থেমে যেন প্রলাপ বকেন চারুবাবু, শিশির—সে কেন আমাকে বলল না একবার! ভীরু! কাপুরুষ! সব মিথ্যা। সত্য বলে কিছু নেই এ সংসারে। কাউকে বিশ্বাস করব না আর। নিরু, আমি মরে যাব এখুনি—আমাকে শক্ত করে চেপে ধর। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাপকে খেয়ে সুখী হোক মেয়ে! আশীর্বাদ? ওরা আমার আশীর্বাদ চায়? হাঃ হাঃ—খাট থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যান চারুবাবু। কথা বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। চিৎকার করে নিরুপমা কেঁদে ওঠেন।

স্বামীর মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেন না নিরুপমা। হয় তো এ আঘাত চারুবাবু সামলে উঠতে পারবেন না। আপিসে যাওয়া আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। শুয়েই থাকেন বেশির ভাগ সময়। আপন মনে বিড় বিড় করে বকেন। ছলছল চোখে বাইরে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন। আর চোখে অন্ধকার দেখেন নিরুপমা।

চুলোয় যাক মেয়ে! এখন যে কোন উপায়ে মেয়ের বাপকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে হয়। এমন অবস্থায় থাকলে আর বেশিদিন বাঁচবেন না চারুবাবু। তাঁর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় দিনে দিনে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁকে ফেরাতেই হবে।

সব ভুলে গেলেন নিরুপমা। মেয়ে যে কলঙ্ক দিয়ে গেছে সেকথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে রইলেন না আর। নতুন অনুপ্রেরণায় স্বামীর সেবায় লেগে রইলেন সকাল থেকে রাত অবধি।

কথা বল? ওগো! আমি কি তোমার কেউ নই? আমার দিকে ফিরে তাকাও না কেন তুমি আজকাল? বয়স হয়েছে বলে তুমিও বুঝি মুখ ফিরিয়ে থাকবে? এই না হলে পুরুষ মানুষ!

মনে হয় সেকথা যেন কানে যায় না চারুবাবুর। স্থির চোখে স্ত্রীর দিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন। তাঁকে চিনতে পারেন কিনা কে জানে।

কি দেখছ অমন করে? তুমি কি আমাকেও চিনতে পার না আজকাল?

পারি, খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন চারুবাবু।

তবে কথা বল না কেন?

দীর্ঘ নিশ্বাস ঝরার শব্দ শুনতে পান নিরুপমা, মেয়েটা এমন করে সর্বনাশ কেন ডেকে আনল আমায় বুঝিয়ে দিতে পার?

আবার সেই এক কথা। কি করবেন নিরুপমা। কেমন করে স্বামীর চিন্তা দূর করবেন—কেমন করে তাঁর এ বুকজোড়া দুঃখ ভুলিয়ে দেবেন। তাঁর চোখের সামনে এমন করে মানুষটা শেষ হয়ে যাবে—সে হতে পারে না কিছুতেই। এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে অনেকক্ষণ তিনি তাকিয়ে থাকেন। দেখতে দেখতে হঠাৎ নিরুপমার চোখের সামনে থেকে বর্তমান মুছে যায়। মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করবার একটা অদম্য ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসে।

যেন সেদিনকার কথা। কোথায় যেন চারুবাবুকে দেখেছিলেন নিরুপমা। তখন দিনকাল অন্য রকম। জাত কুল মিলে গেলেও নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করা যেতনা এখানকার মতন।

প্রস্তাব এল চারুবাবুর দিক থেকে। নিরুপমার মনের কথাও মা টের পেলেন। কিন্তু সাংঘাতিক রকম প্রতিবাদ করলেন দাদু।

চারুবাবুর বংশের নাকি অনেক গলদ—এ বিয়ে হতে পারে না কিছুতেই।

কত বয়স তখন নিরুপমার। পনেরো কি ষোল। হোক লজ্জার কথা। তবু এখানে তাঁর বিয়ে হবে না বলে না খেয়ে কেঁদে কাটিয়েছেন সারাদিন। মা অভিশাপ দিয়ে বলেছেন, নির্লজ্জ মেয়ে। ছি ছি। আর চারুবাবু লুকিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন একটা তাঁকে। এ বিয়ে না হলে তিনি নাকি আত্মহত্যা করে মরে যাবেন।

সত্যি কথা স্বীকার করলে বলতে হয়, চারুবাবুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছিল বৈকি নিরুপমার। হয় তো তখন তা করা সম্ভব ছিল না বলেই তিনি ঘরে বসে কেঁদে কাটিয়েছেন।

যা হোক, শেষ অবধি মা-বাবাই চারুবাবুর সঙ্গে বিয়েটা দিলেন তাঁর। দাদু কিন্তু থাকেননি নিরুপমার বিয়েতে। আড়াল থেকে কেবল গালাগাল করেছেন। সর্বনাশ হবে মেয়ের। এমন ঘরে কেউ বিয়ে দেয়। বাড়ীর লোকগুলোর কাণ্ডজ্ঞান নেই একেবারে।

দাদু আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর আজও কানে ভাসে নিরুপমার। বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে হঠাৎ। ভুলে যান সেই সব দিন শেষ হয়ে গেছে কবে। যৌবনও শেষ হয়ে গেছে তাঁর।

সেই সময় দাদুর চেহারা দেখেননি নিরুপমা। কিন্তু মার মুখে শুনেছিলেন যে স্নেহ আর রাগের অমন অদ্ভুত সমন্বয় সহজে দেখা যায় না। কঠিন কথা বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে দাদুর আর দু চোখ বেয়ে দরদর করে জল ঝরে যাচ্ছে। সেদিন অবস্থাটা চারুবাবুর মতোই বোধ হয় হয়ে ছিল দাদুর।

প্রলাপ বকার মতোই চারুবাবু বলে উঠলেন, সুখী হবে না নিরু, খুকি কিছুতেই সুখী হবে না—

কেন? নিরুপমা আস্তে স্বামীর একটা হাত ধরলেন, আমরা কি সুখী হই নি?

কথার মানে বুঝতে পারেন না চারুবাবু। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমার দিকে। আস্তে আস্তে কথা বলেন নিরুপমা। নিজেদের যৌবন নতুন করে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন।

সঞ্জীবনী সুধার ভাণ্ড তুলে ধরেন তিনি চারুবাবুর মুখের সামনে। একটু একটু করে পান করুন তিনি। মনে মনে মেয়েকে অনেক আগেই ক্ষমা করে ফেলেছেন নিরুপমা। চারুবাবুও যে করবেন সে-বিষয়ে এখন তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ।

ওই তো চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে চারুবাবুর। বার্ধক্যের দ্বার থেকে তিনি যৌবনের দ্বারেই ফিরে আসছেন। যৌবন দিয়ে যৌবনকে শুভ কামনা জানাবেন ওঁরা দুজন।

এখন একবার এ বাড়িতে আসুক ওঁদের মেয়ে জামাই।

২৯শে জানুয়ারী : ১৯৫৮
বুধবার সকাল : কলিকাতা

॥ গহন ॥

একটানা পথ, কোন বাধা নেই, চোখ বন্ধ করে গাড়ির গতি অনেক বাড়িয়ে দিল মোহন। কিন্তু কোথায় যাবে ঠিক করতে পারল না তখনও। কলকাতায় আজ ওর শেষ দিন, কাল প্লেনে দিল্লী যেতে হবে। মলয়ার সঙ্গে আর অনেক দিন তার দেখা হবে না।

নভেম্বরের শেষ দিক। এপাশে ওপাশে কুয়াশা থম থম করছে। যেন এক বিগত যৌবনা বৃদ্ধা বার বার পথ রোধ করছে ওদের, আর হেডলাইটের শানিত ফলায় বিদীর্ণ হচ্ছে তার সারা দেহ। পথের দুধারে দীর্ঘ গাছে সারি, আসন্ন শীতের মৃদু আমেজে বিহ্বল হয়ে থেকে থেকে পাতার কম্পন তুলছে। লেকের এলোমেলো হাওয়া মোটরের কাঁচ ভেদ করে হিমের সঙ্কেত বহন করে আনছে।

মোহনকে মোটরের স্পীড বাড়াতে দেখে মলয়া ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, এত জোরে চালাচ্ছ কেন?

লোকের মনে কৌতূহল জাগাবার জন্যে, মলয়ার ঘাড়ে আস্তে একটা হাত রেখে মোহন হেসে বলল, ওরা ভাববে আমি তোমাকে নিয়ে পালাচ্ছি—

মলয়া রসিকতা উপভোগ করল না। সন্তর্পনে মোহনের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু কে দেখছে আমাদের এখন?

কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখছে, সহজ সুরে মোহন বলল, যে গাড়ি চালাচ্ছি, একবার দেখলে লোকে আর চোখ ফেরাতে পারবে না

ব্যঙ্গের সুর ফুটল মলয়ার কথায়, তাই নাকি?

মলয়ার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ধরতে না পেরে মোহন বলল, সাদা-কালো রঙের এমন জাগুয়ার কলকাতায় কটা লোকের আছে ?

মলয়া আবার হাসল, দিল্লীতেও নেই ?

দেখিনি তো, স্পীড একটু কমিয়ে দিয়ে মোহন বলল, এখানে নামবে ?

এই মাঠের মাঝে ?

আমি আছি, ভয় কি ?

না না ভয় নয়, ঠাণ্ডা লাগবে যে ?

দূর, মুখ দিয়ে অবজ্ঞা প্রকাশের একটা শব্দ করে মোহন বলল, কলকাতায় আবার শীত পড়ে নাকি ? দিল্লীতে গেলে বুঝতে পারবে শীত কাকে বলে।

খুব শীত বুঝি দিল্লীতে ?

বললাম তো, ব্রেক কষে মোহন বলল, নভেম্বর—ডিসেম্বরে সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে।

খুব আস্তে বলল মলয়া, না গেলেই তো হয়।

গাড়ি থেকে নেমে মোহন হেসে বলল, আমার বদলীর কোন সম্ভাবনা নেই, হয় তো সারা জীবন সেখানেই থাকতে হবে আমাদের।

তাহলে আর কি করা যাবে—থাকব।

আমিও তো থাকব, মলয়ার একটা হাত ধরে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে মোহন বলল, শীতের কথা জানতেও পারবে না তুমি। আমি সব সময় তোমাকে তা ভুলিয়ে দেব।

যেন যন্ত্রের মতো মলয়া জিজ্ঞেস করল, কেমন করে ?

আগে থেকে বলব কেন ? যেন তার কথায় একটা বিরাট রহস্য লুকোনো আছে এমন ভাবে মোহন বলল, বিয়ের পর তুমি নিজেই সেকথা বুঝতে পারবে।

কৌতূহল প্রকাশ করবার ইচ্ছে হল না মলয়ার। স্তিমিত স্বরে সে শুধু বলল, বেশ তখন বোঝা যাবে।

কয়েক্‌দিন ধরে মলয়ার কী যেন হয়েছে। নিজেকে বঞ্চনা করতে আর ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে সব কিছু ভুলে, সকলকে তুচ্ছ করে মোহনের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে। মনে সঙ্কোচ নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার কিই বা প্রয়োজন। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে একদিন মিথ্যার প্রাসাদ মুহূর্তে খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। তখন পালাবার পথ থাকবে না আর। তার চেয়ে আগে থেকে সতর্ক হওয়া ভাল।

এইখানে বসে মলয়া, লেকের দিকে যে পথ এগিয়ে গেছে সেখানে একটা ছোট সাঁকোর ওপর মোহন আগে বসে পড়ল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মলয়া বসবার আগে ধুলো ঝেড়ে দিল।

নিঃশব্দে বসে পড়ে মলয়া বলল, কাল তুমি চলে যাবে। বেশিক্ষণ এখানে বস না, হিম লেগে অসুখ করতে পারে—

অত কথায় কথার আমার অসুখ হয় না। লোহার শরীর, জানো তো আমাকে কী পরিশ্রম করতে হয়—

জানি। কিন্তু আমার তো অসুখ করতে পারে?

তা পারে বটে, মলয়ার আরও কাছে সরে এসে মোহন বলল, তোমার এত অসুখ করে কেন মলয়া?

জানি না।

ভাল ডাক্তার দেখালেই তো পার।

দেখাব এখন—অন্য দিকে তাকিয়ে মলয়া চুপ করে বসে রইল।

কি কথা বলবে সে এখন মোহনের সঙ্গে? কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না তার, কিছু শুনতেও চায় না সে। এখানে এমন করে বসে না থেকে সে সোজা বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়তে চায়। বিপুল দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে তার সারা মন। কিছুতেই নিজেকে ঠকাতে পারবে না সে।

দূরে আলো জ্বলছে। সামনে খোলা মাঠ। মাথার ওপর হিমের

আকাশ। সেই রাস্তায় লোক নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা গাড়ি যাচ্ছে। কোন কথা না বলে আলোর দিকে মলয়া তাকিয়ে রইল।

এই পৃথিবীর কোথাও কি এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লোকের জন্যে নিজের সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে হয় না—যেখানে খুব সহজে আত্মগোপন করে থাকা যায়। মলয়ার ইচ্ছে হল মোহনের পাশ থেকে ছুটে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নেয়। তাহলে হাজার চেষ্টা করলেও মোহন কিংবা মলয়ার কোন আত্মীয় তার নাগাল পাবে না।

দেখছ মলয়া, আঙুল দেখিয়ে মোহন বলল, ওরা গাড়ি চালাতে চালাতে আমার মোটরের দিকে বারবার কেমন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে দেখ—

নীরস স্বরে মলয়া বলল, দেখেছি।

আশ্চর্য যেন এই ধরনের কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই মোহনের মুখে। যতক্ষণ তার সঙ্গে মলয়া থাকে সে ঠিক এমনি কথা বলে। নানাভাবে কেবল আত্ম ঘোষণা করে।

একদিন মোহনকে ভাল লেগেছিল মলয়ার। ভাল লাগবার অবশ্য কারণও আছে অনেক। রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি—সব কিছু আছে তার। যা থাকা উচিত তার চেয়ে কিছু বেশি আছে। কাজেই এমন মানুষকে চিরদিনের জন্যে ধরে রাখতে কে না চায়। শুধু ধরে রাখতে চায় নি মলয়া, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে গর্ব বোধ করেছে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে তাদের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে আর মনে মনে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবেছে বার বার।

এসব খুব বেশিদিনের কথা নয়। মাত্র বছর তিনেক আগে মোহনের সঙ্গে মলয়ার আলাপ হয়। কিন্তু সে এমনি এক বাড়ির মেয়ে যে আলাপ হলেই তা গভীর করা তার পক্ষে রীতি মতো কঠিন। জানাজানি হলে তার বাড়ি থেকে একা বার হওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই প্রথমে বাড়ির কাউকে মোহনের কথা সে জানাতে

সাহস পায় নি। এসব কথা ভাবতে গিয়ে আজ কিন্তু অবাক লাগে মলয়ার। কেন, কিসের জন্যে সেদিন মোহনকে তার অত ভাল লেগেছিল!

তখন তার কতই বা বয়স। সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। এমন সময় এক অসতর্ক মুহূর্তে তার সঙ্গে মোহনের আলাপ হল। কিছু-আগে তার এক বন্ধু বীথিকার সঙ্গে অনিমেষের বিয়ে হয়েছে। অসবর্ণ বিয়ে বলে বাড়িতে বাধার ঝড় উঠেছিল! সব তুচ্ছ করে ওরা বিয়ে করল। সেই বিয়ে বাড়িতে মলয়ার সঙ্গে মোহনের আলাপ হয়।

যেদিন প্রথম আলাপ হয় সেদিন মলয়া বুঝতে পেরেছিল মোহন আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে। সেও মনে মনে বলেছিল, আবার যেন দেখা হয়। কারণ মোহনকে দেখে মলয়ার চমক লেগেছিল। বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তাকে। মলয়া বার বার তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হ্যাঁ দেখবার মতো—দেখাবার মতো বটে মোহনের রূপ।

বীথিকার কাছ থেকে মোহনের সম্বন্ধে সব কথা শুনল সে সেদিন। এ বছর কি একটা সরকারী পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দিল্লীতে বড় চাকরি পেয়েছে সে। শিগগিরই সেখানে চলে যাবে। ওর বাবা কলকাতার নামকরা ব্যারিস্টার। তাঁর একমাত্র ছেলে মোহন।

এর চেয়ে বেশি মলয়ার মত মেয়ে আর কি চাইতে পারে। শুধু একটা বাধা ছিল। জাতের সামান্য অমিল। কিন্তু কি এসে যায় তাতে? এত গুণ আছে মোহনের যে সে-বাধা তুচ্ছ মনে হল মলয়ার। লেখাপড়া সে নিজেও যথেষ্ট শিখেছে। অভিভাবকেরা যদি বাধা দেন তাহলে সে তাঁদের বলবে মোহনের চেয়ে ভাল ছেলে খুঁজে এনে তারপর যেন তাঁরা এ বিয়ে ভেঙে দেন। হ্যাঁ সে-সন্ধ্যায় মোহনের সঙ্গে আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে এত কথা মনে এসেছিল তার।

আলাপ হবার পর মোহন প্রথম কথা বলেছিল, এই বিয়েতে নিশ্চয়ই আপনার সায় আছে ?

আছে বলেই তো এসেছি।

একটু চুপ করে থেকে মোহন হঠাৎ বলেছিল, যাক ভাগ্যিস অনিমেষের বিয়ে হল—

একথা বলছেন কেন ?

আমারও পরম লাভ হল এই বিয়েতে—

কি ?

মোহন উত্তর দিয়েছিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হল।

মলয়া হেসে বলেছিল, সত্য কি সেটা খুব বড় লাভ ?

নিশ্চয়ই।

তারপর প্রায়ই তাদের দেখা হতে লাগল। দুই পক্ষের আগ্রহ ছিল সমান।

এই নির্জন সাক্ষাতের কথা ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানল না। কিছুদিন পর একদিন ছাড়াছাড়ি হবার সময় হল। মোহনকে দিল্লী চলে যেতে হবে।

তোমার কাছ থেকে একটা কথা শুনতে চাই মলয়া ?

বল কি কথা ?

না বলতেই বুঝে নাও।

আমি জানি না।

আমি কি তোমার মার সঙ্গে কথা বলব ?

না না—

কেন ?

যদি উনি মত না দেন ? তোমাকে অপমান করেন ?

দূর, হেসে মোহন বলেছিল, তা কি হয় ?

কি ?

ওঁর মত না দেবার তো কোন কারণ নেই।

তবু অসবর্ণ বিয়েতে আমাদের বাড়িতে আপত্তি হবে।

সেদিন মলয়ার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি মোহন। কারণ তার ধারণা ছিল তার মতো ছেলেকে পাত্র হিসেবে গ্রহণ করতে কারুর সামান্য দ্বিধা থাকবে না। মুখে কিছু না বললেও মোহনের অহঙ্কার ভাল লাগে নি মলয়ার। সেদিন এই নিয়ে সে আর আলোচনা করে নি।

মলয়া নিজের কথা বাড়িতে বলেনি কিছুই। তার কোন বন্ধুকে দিয়ে মাকে শুনিয়েছিল মোহনের নাম। কিন্তু বাড়ির প্রত্যেকের কথা শুনে সে সত্যি অবাক হয়েছিল। সেদিন মোহন ঠিকই বলেছিল তাকে। একটি লোকও অসন্তুষ্ট হল না। বরং তারা এমন ভাব দেখাল যেন মলয়ার জন্যে মোহনকে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

তারপর থেকে মোহনের যাতায়াত আরম্ভ হল তাদের বাড়িতে। আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হল না। মা বাবা দাদা দিদি প্রত্যেকে মলয়াকে তার নির্বাচনের জন্যে প্রশংসা করল। এই পৃথিবীর ওপর মলয়ার ধারণা অন্য রকম হয়ে গেল। আর তার নিজের অজ্ঞাতে মোহনের ওপর আকর্ষণ কমে গেল।

ইচ্ছে করলে দু বছর আগেই সে তাকে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু মোহনের কথা শুনতে শুনতে একটা কাঁটা যেন খচ খচ করে উঠত তার বুকের মধ্যে আর নিজের অস্তিত্ব মিথ্যা বলে মনে হত। এটা যেন মিথ্যার পৃথিবী। অলীক দম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সব কিছু।

তোমার কিছু ভাল লাগুক বা না লাগুক, তুমি কিছু চাও বা না চাও—তাতে কিছু যায় আসে না। তোমাকে বাঁচতে হবে অন্য পাঁচজনের মুখ চেয়ে। শুধু অন্যকে দেখাবার জন্যে তোমাকে গ্রহণ করতে হবে এমন একজনকে যে মানুষ হিসেবে তোমাকে শ্রদ্ধা না করলেও সামাজিক পদ মর্যাদায় অনেকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

মোহনের পাশে বসে আজ নানা কথা মনে হচ্ছে মলয়ার। আজ

সব শেষ করে দিতে হবে। এই ক বছরে সে অনেক জেনেছে,. অনেক বুঝেছে। সব ছাড়িয়ে, একটি সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মনে, অন্যের জন্যে নিজেকে এতটুকু ফাঁকি সে দিতে পারবে না। মনে দৈন্য রেখে জাগুয়ার চড়ে ঘুরে বেড়ালে সে শান্তি পাবে না। হয় তো এ পৃথিবীতে আর কারুর সঙ্গে তার মত মিলবে না—তার বাড়ির লোকের সঙ্গে তো নয়ই।

এখন বয়স হয়েছে মলয়ার। সে আরও অনেক মানুষ দেখেছে যারা ব্যক্তিত্বের মূল্য সব চেয়ে আগে দেয়। মোহনকে তার আজকাল দূরের মানুষ বলে মনে হয়। সে চায় এমন কাউকে যে তার জন্যে এক কথায় সব কিছু ছাড়তে পারে।

মলয়াকে বিয়ে করে তার পরিবারকে ধন্য করেছে এমন অর্বাচীনের মতো কথা ভাববার সাহস তার কখনও হবে না। সে হবে এমন মানুষ যে মলয়াকে পেয়ে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাববে না, এ মলয়ার দম্ভ নয়। যদি কোমদিন এমন মানুষের দেখা পায় তাহলে সে নিজেও এমন কথাই ভাববে। সেও প্রস্তুত থাকবে তেমন লোকের জন্যে এক কথায় সব কিছু ছাড়তে। বাইরের লোকের চোখে না হোক সে ঐশ্বর্যবান, হোক না সে অন্য জাত, হোক না সে অন্য দেশের কোন অচেনা অদ্ভুত মানুষ। কি এসে যায় তাতে মলয়ার? কিছু না।

কিন্তু সে যেই হোক, যদি তার জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে চায় তাহলে তাকে একথা স্পষ্ট জেমে নিতে হবে যে মলয়ার চেয়ে মূল্যবান তার কাছে আর কিছুই থাকবে না—জাগুয়ার গাড়ির গর্বে আত্মহারা হবে না সে। যদি কোনদিনও সে তেমন মানুষের দেখা না পায় তাহলে সে সারা জীবন বিয়ে করবে না। আজ মলয়া বুঝতে পারছে মোহন তার সে মানুষ নয়। তাই তাকে সে কথা বুঝিয়ে দিতে সে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

মোহন নিস্তব্ধতা ভাঙল, তুমি কি কোনদিনও ভেবেছিলে তোমার নিজের বেলাও অসবর্ণ বিয়ের কথা ভাবতে হতে পারে?

না।

আমিও ভাবিনি।

কত কি তো লোকে আগে থেকে ভেবে রাখে না।

মোহন বলল, মা বাবা এখনও একথা জানেন না।

মলয়া শুকনো স্বরে বলল, তাই নাকি ?

হ্যাঁ, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে মোহন বলল, আমাকে এবার ওদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে।

কেন ?

কারণ আমার জন্যে তারা একেবারে অন্যরকম মেয়ের কথা ভেবে রেখেছিলেন। তোমার সঙ্গে তার এতটুকু মিল নেই। তাই আমার পছন্দ দেখে তারা খুব অবাক হয়ে যাবেন।

মলয়া প্রশ্ন করল, কেমন মেয়ের কথা তাঁরা তোমার জন্যে ভেবে রেখেছিলেন বলতে পার ?

একটুও ইতস্তত না করে মোহন বলল, একটু বড়লোকের মেয়ে তারা চান আর কি—

বিরক্তি চেপে রেখে মলয়া বলল; থাক বুঝেছি। কিন্তু তোমার সংগ্রামে বাহাদুরীর কিছু নেই। যারা এমন বিয়ে করে তাদের সকলকেই সংগ্রাম করতে হয়।

সিগ্রেটে টান দিয়ে মোহন বলল, আর তাদের দিক থেকে তোমাকে স্বীকার করে নেয়ার জন্যে আমারও তো জোর করবার বিশেষ কিছু নেই—

মলয়া বলল, বুঝেছি।

কিন্তু অনেক হয়েছে। আর নয়। এখানেই টানতে হবে পূর্ণচ্ছেদ। আর বাড়তে দেবে না মলয়া। যত ক্ষতি হোক তার, এ নির্বাচন সে কিছুতেই সহ্য করবে না। এই বিরুদ্ধভাব নিয়ে কোন সাহসে মোহন তাকে কামনা করতে চায়। বাড়ির লোকের সঙ্গে সংগ্রাম করবার আগেই এসব কথা তার মনে হবে কেন ? ভালবাসা গভীর

হলে মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়, তখন কে কি ভাববে আর কি বলবে এসব কথা মাথায় আসে না।

তাই মোহনের কথা শুনতে শুনতে মলয়া ভাবল এ হয়তো তার নিজেরই কথা এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এসব নিয়ে তাদের একদিন কথা কাটাকাটি হবেই। সমস্ত দম্ভ যে বিসর্জ্জন দিতে পারে না তাকে কিছুতেই শ্রদ্ধা করতে পারবে না সে।

মলয়া বলল, আমাকেও সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু তা করবার জন্যে এতদিন ধরে আমি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। আজ সেকথা বলব তোমাকে।

তোমাকে সংগ্রাম করতে হবে কেন? গর্বের হাসি হেসে মোহন বলল, আমার মতো ছেলেকে নিয়ে বাংলাদেশের কোন মেয়েকে কোনদিনও অভিভাবকের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে না। আমাকে কেউ অস্বীকার করতে পাববে না মলয়া—

মলয়া দৃঢ়স্বরে বলল, অভিভাবকের কথা নয়। বাংলাদেশের সব মেয়ের কথা জানিনা, একটি মেয়ের কথা জানি। তোমাকে স্বীকার করবার জন্যে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে সে একেবারে হেরে গেছে—

তুমি কার কথা বলছ মলয়া?

আমি আমার কথা বলছি। আমাকে নিয়ে তোমার আত্মীয়দের সঙ্গে সংগ্রাম করবার আর প্রয়োজন নেই। আমি নিজে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারব না।

কিন্তু কেন? মলয়ার কথা শুনে মোহন অবাক হয়ে বলল, এসব তুমি কি বলছ?

আমি ঠিকই বলছি। আমি ভুল করেছিলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা কর—

বাঃ, তাহলে এতদিন সে কথা আমাকে জানাওনি কেন?

সুযোগ হয় নি। তুমি নিজেও সব কথা এত স্পষ্ট করে এর আগে আমাকে কখনও জানাও নি।

আমি কি জানাব তোমায়?

যে তুমি সব দিক থেকে আমায় ধন্য করেছ—

সেকথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

পারি বলেই তো তোমাকে প্রত্যাখান করবার সাহস আমার আছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মলয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে মোহন বলল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মলয়া। আমাকে প্রত্যাখান করলে তোমাকে সারা জীবন অনুতাপ করতে হবে সেকথা বুঝতে পারছনা কেন?

না আমাকে অনুতাপ করতে হবে না। বরং আর পাঁচজনের কাছে তোমাকে নিয়ে গর্ব করতে গেলে সারাজীবন আমাকে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে—

কেন?

কারণ আমার জীবনে তুমি কোনদিনও পূর্ণতা আনতে পারবে না, এক মিনিট চুপ করে থেকে মলয়া বলল, তোমায় কথায়, তোমার ধ্যানে, তোমার ধারণায় আমার কোন মূল্য নেই। আমার ব্যক্তিত্বকে সামান্য শ্রদ্ধা করনা তুমি। যেদিন আমি তোমাকে প্রথম দেখি সেদিন আমার হয়তো কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। আমি ভাবতে পারিনি নিজে কতখানি পাব। আর পাঁচজন আমার নির্বাচনে প্রশংসা করবে আমি শুধু সেকথা ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ সবচেয়ে আগে নিজের কথা ভাববার মতো জ্ঞান আমার হয়েছে। তাই তোমাকে অস্বীকার করবার মতো সাহস এসেছে আমার মনে—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মোহন বলল, বেশ। আমি সব বুঝলাম। তবে তুমি ভেব না তোমাকে হারিয়ে আমার কোন ক্ষতি হবে। তুমি তো জান আমার কোন অভাব নেই।

খুব ভাল করে জানি, মলয়া হাসল, তাই তোমার কোন মূল্য আর আমার কাছে নেই। আমি যদি বুঝতাম আমাকে বাদ দিয়ে

তোমার সামান্য অসুবিধা হবে, তুমি যদি আমাকে অন্য চোখে দেখতে পারতে তাহলে কিছুতেই আমি তোমাকে প্রত্যাখান করতে পারতাম না—

বাধা দিয়ে মোহন বলল, এসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না, চল বাড়ি যাই ?

মলয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল।

গাড়ির মধ্যে বসে কেউ কোন কথা বলল না। বলবার কথা যেন আর কিছু নেই—যেন কোনদিন ছিলও না!

মুক্তির আনন্দে মলয়ার মন ভরে উঠেছে। এইবার অসংখ্য আত্মীয় আর পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শুরু হবে তার সংগ্রাম। কেন সে মোহনকে ফেরাল সেকথা সহজে বুঝতে চাইবে না তারা। মূর্খ বলে মনে করবে তাকে। অবাক হয়ে যাবেন তার মা বাবা।

কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে মলয়া। সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। তাই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে মোহনের অহঙ্কার।

জাগুয়ার গাড়িতে বসে মলয়া সেই কথাই ভাবছিল। সে যেন চিরদিনই এমনি থাকতে পারে। কোন কিছুর মোহে শুধু আত্ম জাহিরের চেষ্টায় সে যেন নিজেকে নিজে ফাঁকি না দেয়।

এইখানে আমাকে নামিয়ে দাও, ট্র্যাম লাইনের ওপর গাড়ি এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মলয়া বলল।

ব্রেক কষে মোহন বলল, এখানে কেন ?

মাথাটা বড় ধরেছে, আমি ট্র্যামে বাড়ি যাব।

তাহলে তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না ?

মলয়া মৃদুস্বরে বলল, না।

বেশ, মোহনের জাগুয়ার কেঁপে উঠল। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখুক অন্য লোক কিন্তু মলয়া দীন চোখে ওদিকে আর কখনও তাকাবে না।

২৬শে সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬
বুধবার সকাল : কলিকাতা

॥ মহোৎসব ॥

সেই ভাড়াটেকে নিয়ে যত গোলমাল।

হ্যারি বাড়িতে বিদেশী ভাড়াটে রাখতে চায় না। ভারতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার তার এতটুকু ইচ্ছে নেই। মান খুইয়ে যখন পেয়িং গেস্ট রাখতে হচ্ছে তখন দেশের লোকই তো ভাল। সকাল বেলা এই নিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে রীতিমতো তর্ক হয়ে গেল।

মারগারেট শুনবে না। সে তার বন্ধু নরোত্তমকে এ বাড়িতে আনবেই। দিল্লীর ছেলে নরোত্তম। এদেশে পড়াশুনো করতে এসেছে। মারগারেট অল্প কয়েকদিন তার সঙ্গে মিশে বুঝতে পেরেছে যে সে খুব ভাল ছেলে। আর এখন তার থাকবার জায়গার অভাব। পেয়িং গেস্ট যখন বাড়িতে নেয়া হচ্ছে তখন নরোত্তমকে রাখলে ক্ষতি কি!

হ্যারি স্পষ্ট বলল, বিদেশীর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা আমি অপমান বলে মনে করি।

মারগারেটের মা ইডিথ যোগ করল, আর ওদের নানারকম অভ্যাস থাকে, বাড়িতে ইচ্ছে করে অশান্তি ডেকে এনে লাভ কি মারগারেট?

মারগারেট বাপ, আর মার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, একজন লোককে একেবারে না জেনে তার সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত উক্তি তোমরা কেমন করে করছ আমি সেকথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি—

চেয়ারের হাতলে পাইপ ঠুকে হ্যারি বলল, এ আর জানাজানি

কি, কালো রঙের লোকের অনেক বদ অভ্যাসের কথা সবাই বলাবলি করে।

মারগারেট স্বরে ঝাঁজ মিশিয়ে বলল, কি যে বল বুঝতে পারি না। পৃথিবীর কোন খবর না রেখে আমার মনে হয় হুমদাম যা-তা কথা না বলাই উচিত।

হ্যারি গম্ভীর স্বরে শুধু বলল, মোট কথা ব্ল্যাকম্যানকে আমরা বাড়িতে রাখতে পারব না।

আর আমি যদি বলি, তোমার দলের কোন অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে হলে আমিও লজ্জায় মরে যাব তাহলে কি করবে?

মানে মানে, পাইপ কামড়ে হ্যারি বলল, সাদা লোক আবার অশিক্ষিত হয় নাকি?

খুব জোরে হেসে মারগারেট বলল, তা আর হয় না?

তা যাক মা, ইডিথ মেয়ের পিঠে হাত দিয়ে বলল, তোর কালো বন্ধুকে বল্ যে ঘর ভর্তি হয়ে গেছে, খালি নেই। পরে খালি হলে তোমাকে জানাব, একটু থামল ইডিথ, আর তুই ওদের সঙ্গে মেশা ছাড়—

আমার যা খুশি তাই করব, হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল মার-গারেট, যা চাই কিছুই তো দিতে পার না। এত লেখাপড়া শেখবার ইচ্ছে ছিল, তাও করতে দিলে না। জোর করে বাজে চাকরিতে ঢোকালে। এখন যে একজন বিদ্বানের কাছে লেখাপড়া করি, সেটাও তোমাদের সহ্য হয় না—কেবল তার খুঁত ধরতে চেষ্টা কর—

ব্যাপার বেগতিক। মেয়েকে বাপ মা একটু ভয় করে যেন। মারগারেটের মেজাজ দেখে যে যার সরে পড়ল। ওরা চলে যাবার পর প্রথম কয়েক মুহূর্ত মারগারেট কি করবে ভেবে পেল না। তারপর বাইরে বার হল নরোত্তমের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে।

তারপর কোথা থেকে কি হল, শেষ অবধি একদিন দেখা গেল দিল্লীর নরোত্তম জিনিসপত্র নিয়ে হ্যারির খালি ঘর পূর্ণ করল। বাপ মা তার সঙ্গে তেমন কথা বলে না বটে কিন্তু নরোত্তমের তাতে কিছু যায় আসে না, মেয়ে তার সঙ্গে দিব্যি মেলামেশা করে।

এমন করে পেয়িং গেস্ট নেবার কথা হ্যারি এর আগে আর কখনও ভাবতে পারে নি। তার টাকার দরকার সেকথা সত্যি কিন্তু কে ভেবেছিল যে লণ্ডনের সব জিনিসের বাজার দর এত চড়ে যাবে যার জন্যে উপার্জন বাড়াবার আশায় তাকে বাড়ির মধ্যে ভাড়াটে ঢোকাতে হবে।

বাড়িতে ভাড়াটে এদেশে তো অনেকে রাখে। তাতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু হ্যারির ব্যাপার একটু আলাদা। তার ঘরের খবর সে সকলকে জানতে দিতে চায় না, এদেশের সাদা রঙের ভাড়াটে হলেও সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে তার বাধে।

হ্যারি টাওয়ার অব লণ্ডনের একজন প্রহরী। আরও অনেক প্রহরী আছে কিন্তু হ্যারি বোধহয় সবচেয়ে পুরনো লোক। তার কাজ হল যে বাড়িতে মণি-মুক্তো আর নানা মূল্যবান অলঙ্কার আছে তার সামনে সেজেগুজে বন্দুক হাতে নিয়ে পাহারা দেওয়া। লাল পোশাক তার, দামী বুট।

সারাদিন বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মন মাঝে মাঝে সুদূর অতীতে যেন পাখা মেলে উড়ে যায়। তার মনে পড়ে ইংল্যাণ্ডের গৌরবোজ্জ্বল অনেক ইতিহাস। ইংরেজের মতো বীর আর কে আছে। কত যুগ ধরে তার সাক্ষ্য বহন করে নিয়ে চলেছে এই টাওয়ার অব লণ্ডন। কতবার ব্যর্থ হয়েছে শত্রুর কত বোমা বন্দুক কামান, জ্বলে পুড়ে গেছে কত জাহাজ, চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে কত প্লেন তবু আজ অবধি কেউ জয় করতে পারে নি ইংল্যাণ্ড—লণ্ডনের পথগুলি কখনও বিচলিত হয়ে ওঠেনি কোন বিদেশী বিজয়ীর পদক্ষেপে। এমন গর্ব আর কোন্ জাত করতে পারে।

সহসা যেন হ্যারির বুক ফুলে ওঠে। সে তাকিয়ে দেখে তারই সীমানায় অর্থাৎ রত্নকুঠিতে অনেক লোক আসছে নানা রত্নসম্ভার দেখতে—জার্মান, ফরাসী, চীনে, ভারতীয়—আরও কত দেশের কত রকমের লোক। হ্যারি তাদের দেখে একবার শব্দ করে মাটিতে বন্দুক ঠুকে ভাবে, দেখুক এরা আমাদের সম্পদের চিহ্ন, জানুক বৃটেনের পরাক্রমের ইতিহাস। এত বিক্রম আর কার! সেই ঘরেই ভারতবর্ষের খণ্ডিত কোহিনুর জ্বলে।

ইস্টএণ্ডে টাওয়ার অব লণ্ডন। টিউব স্টেশনের নাম টাওয়ার হিল। চারপাশ অত্যন্ত অপরিষ্কার। ভ্যাপসা গন্ধে মাঝে মাঝে বাতাস ভরে যায়। এপাশে ওপাশে দুঃস্থ ইংরেজের বস্তী। চোখে পড়ে জার্মান বোমায় বিধ্বস্ত অনেক বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। পাশেই শীর্ণ টেমস নদী।

টাওয়ার ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে অনেক পথিক অনেক সময় চারধারে তাকিয়ে দেখে তাদের মহিমার ইতিহাস। গরিবের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সস্তা জামাকাপড় পরে টাওয়ার অব লণ্ডনের চারপাশে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। ভারতবর্ষের লোক দেখলে মাঝে মাঝে 'ব্ল্যাকি' 'ব্ল্যাকি' করে চেঁচিয়ে মজা করবার জন্যে অনেকক্ষণ পিছু নেয়। আর তাদের মা বাবারা টাওয়ার অব লণ্ডনে জনসমাগম দেখে খুশি হয়। ভাবে, যাক ওরা ভেতরে, দেখুক আমাদের বিক্রমলব্ধ সম্পদরাজি আর বুঝুক আজও আমরা অজেয়—আজও আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত।

টাওয়ার অব লণ্ডনের গেটে টিকিট কেটে প্রবেশ করে বিদেশের নানা দল। আর আনন্দে ব্রিটিশের বুক দোলে।

জয়ের এমনি অনির্বচনীয় আনন্দে হ্যারির বুক ভরে থাকে সারাক্ষণ। সে আরও সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কারণে অকারণে জুতো ঠক্ ঠক্ করে আর পরম আগ্রহে মাঝে মাঝে আগন্তুকদের বলে দেয় কি কি রত্ন এই রত্নকুঠিতে তারা দেখতে পাবে। তারপর অন্য কুঠিতে

আরও কি কি আছে সেকথাও তাদের জানিয়ে দিতে ভোলে না হ্যারি। যেমন ও বাড়িতে পোশাক-আসাক, সে-বাড়িতে বন্দুক তলোয়ার, এই পাশেই অষ্টম হেনরীর স্ত্রীকে যে গিলোটিনে হত্যা করা হয়েছিল সেই গিলোটিন।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি টাওয়ার অব লণ্ডনের সম্পদ এমনি করে আগলাতে আগলাতে হ্যারির মনও বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। এত বেড়ে উঠেছিল যে প্রায়ই তার খেয়াল থাকত না ইস্টএণ্ডের অতি সাধারণ অপরিষ্কার ঘরে সে বাস করে। টিপ টিপ বর্ষায় সেখানে দিনরাত ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া যায়, খরচ কেমন করে কমানো যায় সে কথা ভেবে মাথা ধরে ওঠে।

তা কারই বা না ধরে ওঠে। যুদ্ধ বিগ্রহ আর নানা দৈবদুর্বিপাকের জন্যে এখন দেশের অবস্থা একটু খারাপ হয়েছে বটে, তার জন্যে সামান্য কষ্ট সহ্য করা কিছু বিচিত্র নয়। উপায় কি! তবু ইংরেজ কারোর কাছে মাথা নিচু করে হাত পাতবে না, হার স্বীকার করবে না। শক্তি সামর্থ আর পরিশ্রম দিয়ে সব ঠিক করে নেবে। এ জাতের ঐতিহ্য ম্লান হবার নয়। অনমনীয় দৃঢ়তা চিরকাল সমস্ত বৃটিশকে বাঁচিয়ে রাখবে। এখন ধৈর্য ধরে দেখা যাক কি হয়।

ইডিথকে হ্যারি যা বোঝায় সে তাই বোঝে। তার বেলায়ও জাতের গর্ব ভোলে না হ্যারি। ইংরেজ না হলে কি আর এমন স্ত্রী হয়! কিন্তু শুধু মেয়েটা কেমন যেন হয়েছে। বাপ মাকে একেবারে মানতে চায় না, কথার ধাক্কায় সব গোলমাল করে দেয়। সে যে কখন কোথায় থাকে, কাদের সঙ্গে মিশে কোথায় কি কাজে ঘুরে বেড়ায় হ্যারি ইডিথ জানতে পারে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে মেয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলে, যারা লেখাপড়া জানে আমি তাদের সঙ্গে মিশি, তোমরা তো আর আমাকে পড়াশুনো করতে দিতে পারলে না তাই আমাকে অনেক জায়গায় ঘুরে অনেক শিখে নিতে হয়।

কথাটা মিথ্যে নয়। ছেলেবেলা থেকে মারগারেটের লেখাপড়ার

দিকে খুব বেশি ঝোঁক। কিন্তু লণ্ডন ম্যাট্রিক ওর কিছুতেই দেয়া হল না। সংসারের এমনি অবস্থা হল যে ওর চাকরি না নিলেই নয়। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু টাকা দিলে সংসারে বেশ সাহায্য করা হয়। তাই চাকরি নিতে বাধ্য হল মারগারেট। কোন সদাগরী আপিসে সপ্তাহে তিন পাউণ্ড দশ শিলিং মাইনের সাধারণ কেরানি।

চাকরি করতে কিন্তু খুব ভাল লাগত না তার। কেবলই মনে হত, এত উন্নত সমাজের এমন অবস্থা হল কেন। যে পড়াশুনো করতে চায় সে তা করতে পারে না কেন? কেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে নানা ছোট কাজ করতে হয়? কোন অদৃশ্য শক্তি নিমেষে নিমেষে রুদ্ধ করে দেয় সহজ মানুষের প্রাণের প্রকাশ।

আপনার মনে গুমরে জ্বলে গেলেও হয়তো মা বাবার ওপর কোন রাগ মারগারেটের থাকত না যদি তারা অলীক দম্ভে দিশা না হারিয়ে যুক্তিপূর্ণ কথা বলতো। কিন্তু তারা সব সময় মারগারেটের কাছে নিজেদের অজ্ঞতা এমন করে প্রকাশ করে যে সে তাদের আঘাত না করে পারে না। নরোত্তম তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কি দরকার ছিল শুধু ভারতীয় বলে তাকে ওসব কথা তুলে অপমান করবার। এত কম বয়সে কত বেশি জানে সে। অমন বন্ধু পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে মারগারেট। এর আগে এমন বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে তার আর কখনও আলাপ হয়নি।

কিন্তু অবশেষে তারা বাধ্য হল নরোত্তমকে ঘর ছেড়ে দিতে। মারগারেট জানত শেষ অবধি রাজি তাদের হতেই হবে। বাজার বড় খারাপ। এই ঘরে দেড় পাউণ্ড ভাড়া দিয়ে কে থাকতে রাজি হবে।

নরোত্তম মালপত্র নিয়ে আসবার আগে ঘর দেখে গিয়েছিল অনেকেই। কিন্তু কারোর পছন্দ হয় নি, যাদের হয়েছিল ভাড়া শুনে তিন পা পেছিয়ে নমস্কার করে তারা পালিয়ে গেল। এদিকে

দিনে দিনে খরচ বাড়ছে, সংসারের অভাব বেশি হচ্ছে, এমন অবস্থায় আর বেশি দিন টানা চলবে না। ওদিকে মারগারেট ঘন ঘন তাগিদ দিচ্ছে নরোত্তমকে ঘর ভাড়া দেবার জন্যে।

হ্যারি একদিন বলল, ওর গায়ের রঙ কেমন রে ?

মারগারেট ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দিল, কুচকুচে কালো।

তাহলে কি করে হবে ?

এইসব কথা শুনেই রাগে মারগারেটের সমস্ত শরীর জ্বলে যায়। সে বাপের বয়সের কথা ভুলে জোর করে বলে, সব সময় এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বল কেন বুঝতে পারি না।

তা, থেমে থেমে হ্যারি বলল, কিছু বেশি ভাড়া যদি দেয় তো ভেবে দেখতে পারি—

কেন দেবে শুনি ? আর তোমরাই বা বিদেশী পেয়ে এমন ঠকাবে কেন শুনি ?

ইংরেজ হয়ে কি বলছিস তুই ? ইংরেজ কি কখনও ঠকাতে পারে ?

মারগারেট বলল, তোমার কথায় তো তার প্রমাণ পাচ্ছি না। কেবলই ঠকাবার ফন্দী। এই নোংরা পাড়ার জঘন্য ঘরে বেশি ভাড়া দিয়ে কোন ভদ্রলোক আসবে শুনি ?

তাই তো বলছিলাম, মেয়ের কথার উত্তরে হ্যারি বলল, কালো রঙের লোক যদি বেশি ভাড়া না দেয়—

অমন অমার্জিত ভাষায় কথা বল না বাবা, আমার মনে বড় আঘাত লাগে। সে কোন পাড়ায় কি ভাবে থাকে গিয়ে দেখে এস। টাওয়ার অব লণ্ডনের দারোয়ান হয়ে তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করো, কারণ লেখাপড়া শেখোনি। নরোত্তম অত বড় লোকের ছেলে অথচ এতটুকু অহঙ্কার নেই কারণ সে লেখাপড়া শিখেছে। আর তার জানবার কৌতূহল বেশি বলেই প্রচুর টাকা খরচ করে এদেশে এসেছে —বাপের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে মারগারেট আবার

বলল, আমাদের দেশের অনেক বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা ওকে সব সময় ঘিরে থাকে। তবু তার মন এত উদার যে লেখাপড়ায় আমার ঝোঁক আছে বুঝতে পেরে সকলকে এড়িয়ে সে আমার সঙ্গে বেশি মেশে—কিন্তু এদেশের অনেক লোক আমাদের কি চোখে দেখে সেকথা তুমিও জান আমিও জানি, কাজেই আর কিছু বলবার দরকার নেই, হ্যারিকে কথা বলবার অবসর না দিয়ে মারগারেট অতিদ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

যাহোক যথাসময়ে দিল্লীর নরোত্তম এসে উঠল হ্যারি—ইডিথ—মারগারাটের ইস্ট এণ্ডের বাড়িতে। সপ্তাহে দেড় পাউণ্ড ভাড়া দিতে এক কথায় রাজি হল সে। মারগারেট জানত তার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। আরও অনেক বেশি ভাড়া বললেও সে এ বাড়িতে আসতে দ্বিধা করত না। মারগারাটের কথা সে ঠেলতে পারে না কখনও।

কিন্তু আরও বেশি ভাড়ার কথা কোন মুখে বলবে সে। দেড় পাউণ্ড মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেই তার লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। এত ভাড়া দিয়ে ইস্ট এণ্ডে কে আর সাধ করে থাকতে আসে। বিশেষ করে নরোত্তমের মতো উঁচু দরের লোক। শুধু তার কথায় থাকতে এলো সে।

মা'গারেটের বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না যে মা বাবা নবোত্তমের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকায়। তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। কাজেব কথা ছাড়া তার সঙ্গে একটাও বাজে কথা বলে না। অথচ তার সুবিধা অসুবিধার দিকে সব সময় তাদের সজাগ দৃষ্টি। কেননা সে উঠে গেলে তাদের মুশকিল হবে। এমন শান্তশিষ্ট উপদ্রব-হীন ভাড়াটে তারা আর কোথায় পাবে। মুখ বুজে সে শুধু ভাড়া গোনে। হাজার অসুবিধা হলেও মুখ ফুটে বলবার লোক নরোত্তম নয়।

মারগারেট আরও বুঝতে পারে যে তাকে পেয়ে ইডিথ আর

হ্যারির কত সুবিধা হচ্ছে, সংসারের অনটন আস্তে আস্তে কমে আসছে। নরোত্তম আসবার পর কয়েকদিন ধরে বাড়িতে দিব্যি ভাল খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। কাজেই বিদেশীকে অন্দরে ঢোকাবার ইচ্ছে না থাকলেও বিদায় করে দেবার আর উপায় নেই। কারণ হ্যারি আর ইডিথ মনে মনে ভাবে অভাবের চেয়ে অন্দরমহলে ভারতীয়কে চলে ফিরে বেড়াতে দেখা অনেক ভাল।

সংসারের অভাবের হাত এড়াতে কে আর না চায়। তাই নরোত্তমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে না থাকলেও তার টাকা নিতে সামান্য অনিচ্ছানেই হ্যারি ইডিথের। উপায় কি, যা দিনকাল পড়েছে। মারগারেট সব বোঝে আর মা বাবার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে মনে মনে হাসে।

তারপর হঠাৎ একদিন সারা ইংল্যাণ্ডের হাওয়া ঘুরে গেল। লণ্ডনে নাকি উৎসব হবে—সারা ব্রিটেনের উৎসব—ফেস্টিভেল অব ব্রিটেন। লোকের মনে খুশি আর ধরে না।

ওয়াটারলু ব্রিজের কাছে জায়গা ঠিক করা হল। বিজ্ঞাপনের জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করল ব্রিটিশ সরকার। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল ব্রিটেনের এই উৎসবের কথা।

যা কাণ্ড-কারখানা হবে তেমন আর কখনও ব্রিটেনে হয় নি। এদের আয়োজন দেখে তাই মনে হয় বটে। একেবারে নতুন থিয়েটার হল তৈরী হল। বই ছবি আরও নানা প্রদর্শনীর জন্যে ঘর উঠল, অনেক রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা হল, অজস্র রকম আনন্দের বন্দোবস্ত করতে লাগল সমস্ত পৃথিবীর অনেক জ্ঞানীগুণী লোক। আলোকমালা নির্ণয় করবার জন্যে প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ার অন্য কাজ ভুলল। কত টাকা খরচ করা হবে সেকথা ভাবলে বিস্ময় জাগে। উৎসব আরম্ভ হতে এখন মাস কয়েক দেরি আছে কিন্তু এর মধ্যেই ওয়াটারলু ব্রিজের ওপর দিয়ে চলা যায় না, সব

সময় সেখানে এত মানুষের ভিড় জমে থাকে। ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী বুড়োবুড়ি হাঁ করে উৎসবের মণ্ডপের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ সেখানে শিল্প নির্দেশ দিচ্ছে, কেউ আলো সাজাচ্ছে, কেউ বাড়ি তৈরী করছে, কেউ মণ্ডপের শোভা বাড়াবার জন্যে বিদেশ থেকে আনানো মূল্যবান গাছ পুঁতছে। কর্মীর চিৎকারে, ক্রেনের তীক্ষ্ণ শব্দে, আপামর জনসাধারণের বুক জোড়া উল্লাসে মুখর হয়ে উঠেছে ব্রিটেনের উৎসবমণ্ডপ।

দেখতে দেখতে সেই বিশেষ দিন এল। ১৯৫১ সালের তেসরা মে। কী আশ্চর্য্য উল্লাস সেদিন লণ্ডনের জনতার চোখে মুখে। যদিও কয়েক মাস ধরে চলবে এই উৎসব তবুও তারা যেন ধৈর্য ধরতে পারছে না, দলবেঁধে ঊর্ধশ্বাসে যাচ্ছে ওয়াটারলু ব্রিজের দিকে।

সন্ধ্যেবেলা জ্বলে উঠল অসংখ্য আলোকমালা। তার ছায়া পড়ল নিস্তরঙ্গ টেমসের জলে। বাজনা শোনা গেল। চারপাশে জেগেছে আনন্দের সাড়া। সত্যি এমন উৎসব জীবনে আর কেউ কখনও কোথাও দেখেনি। এত বড় মণ্ডপ যে একদিনে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঘুরে দেখে শেষ করা যায় না। অন্তত তিনদিন আসতে হয়। তাই গরিবের ঘরে নানা কথা ওঠে। ইডিথ আর হ্যারির এই উৎসবের দিনেও ভাবনার শেষ নেই—উৎসব মণ্ডপে কেমন করে তারা প্রবেশ করবে, কাঁটার মতো মনে শুধু বেঁধে সেই এক চিন্তা। এত খরচ তারা কেমন করে করবে!

হ্যারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, তাই তো কি যে করি!

করবে আবার কি, স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে ইডিথ বলল, এত বড় উৎসব আর কখনও হয়েছে এদেশে? যেমন করে হোক আমাদের দেখতে যেতেই হবে—

সব বুঝি ইডিথ। কিন্তু ও উৎসব আমাদের জন্যে নয়, স্ত্রীর ঘাড়ে হাত রেখে হ্যারি বলল ঢুকতে লাগে দশ শিলিং, একদিনে সব দেখে শেষ করা যায় না, দু তিনদিন লাগে, সকাল থেকে সন্ধ্যে

অবধি ভেতরে থাকলে খাওয়া দাওয়ার জন্যে কিছু খরচ করতে হবে তো—

খুব আস্তে ইডিথ বলল, তা তো হবেই।

মনে মনে হিসেব করে হ্যারি আবার বলল, রোজ সব সুদ্ধ এক এক জনের এক পাউণ্ড করে লাগছে, তিনদিনে তিন পাউণ্ড। তাহলে তোমার আমার মিলিয়ে পড়ছে গিয়ে প্রায় ছ পাউণ্ড। এত টাকা কোথায় পাব!

কিন্তু উৎসব না দেখেই বা থাকব কেমন করে। যেমন করে হোক তুমি একটা ব্যবস্থা কর, অসহিষ্ণু স্বরে বলল ইডিথ।

জুতোর তলায় পাইপ ঠুকে স্বরে হতাশা মিশিয়ে হ্যারি বলল, মণ্ডপের ভেতরে রেস্তোরাঁগুলোয় খাবারের নাকি গলা কাটা দাম। কোন রকমে ভেতরে যেতে পারলেও সেখানে কিছু মুখে দেবার উপায় নেই।

দরকার নেই কিছু মুখে দেবার, না হয় উপোস করে ঘোরা যাবে, দৃঢ়স্বরে ইডিথ বলল, সকলেই যাচ্ছে, মারগারেট তো রোজ ছু বেলা যাচ্ছে, অথচ শুধু আমরা কারোর সামনে মুখ দেখাতে পারছিনা, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখ বুজে থাকতে হচ্ছে, একটু থেমে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ইডিথ বলল, এত বড় উৎসব ব্রিটেনে আর কখনও হয়েছে?

কিন্তু সেকথায় কান না দিয়ে অবাক হয়ে হ্যারি বললো, বল কি, মারগারেট রোজ রোজ যাচ্ছে কেমন করে?

ওই দিশি বন্ধু। কালো হলে হবে কি, অনেক পয়সা ওর। খরচও করে খুব।

তাই নাকি? পাইপে দীর্ঘ টান মেরে হ্যারি অবাক হয়ে বলল, চেহারা দেখে তো মনে হয়না যে পয়সা কড়ি আছে—

চেহারা মানুষের সব নয়, একটু ঝাঁজের সঙ্গে ইডিথ বলল, শুধু চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় নাকি? টাওয়ার অব লণ্ডনে

বন্দুক হাতে তুমি যখন দাঁড়িয়ে থাক তখন তো তোমাকে আঠারো শতাব্দীর নাইট বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তুমি তো আর তা নও।

তা বটে, তা বটে, স্ত্রীর কথায় অপ্রস্তুত হয়ে হ্যারি ঘন ঘন পাইপের ধোঁয়া ছাড়ে।

সেই রাতে খাবার টেবিলে নরোত্তম হ্যারিকে জিজ্ঞেসে করল, ফেষ্টিভেল দেখবেন না মিস্টার ইংল্যাণ্ড ?

স্বামী কিছু বলবার আগেই ইডিথ বলল, দেখবার তো খুব ইচ্ছে তবে যা খরচ—

হ্যারি বলল, উই কান্ট অ্যাফোর্ড অ্যাট দি মোমেণ্ট।

ছু এক মিনিট কি ভেবে মারগারেটের দিকে তাকিয়ে নরোত্তম বলল, আমার অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে আপনাদের নিয়ে যেতে, আমরা তো রোজই যাচ্ছি আজকাল। কাল চলুন না আমাদের সঙ্গে, আমি আপনাদের নেমন্তন্ন করছি, হেসে নরোত্তম বলল, কি মারগারেট রাজী ?

মারগারেট উত্তর না দিয়ে হাসল শুধু। ইডিথ চোখে মুখে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। হ্যারির চেহারা দেখে মনে হল তার ছুর্ভাবনা একেবারে মিলিয়ে গেছে। কপালে চিন্তার একটি রেখাও নাই। আজ প্রথম তার নরোত্তমকে বড় আপনার মনে হল। সে যেন তার বাড়ির ছেলে।

বেশ বেশ, অনেক ধন্যবাদ নরোত্তম, কাল আমারও ডিউটি নেই। তুমি কি বল ইডিথ, তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো ?

আমার আবার অসুবিধা কি, হেসে ইডিথ বলল, আমি তো ফেস্টিভেলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বসে আছি, তোমার জন্যেই তো এতদিন যাওয়া হয়নি, নরোত্তমের দিকে তাকিয়ে ইডিথ বলল, অনেক ধন্যবাদ বাছা, খুশি হয়ে যাব, আহাহা, খাওনা পুডিংটা ভাল করে—

হ্যারি বলল, তুমি তো অসুবিধার কথা কিছুই বল না। খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে তো আমাদের এখানে ?

না না কিছুনা, পুডিং শেষ করে নরোত্তম কফির কাপ সামনে টেনে নিয়ে চুমুক দিল।

ব্যবধানের বিরাট প্রাচীর অকস্মাৎ যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। সাত হাজার মাইল দূরের লোককে আজ মা বাবা কেন এত সহজে ঘরের ছেলে মনে করতে পারল সেকথা ভেবে মারগারেটের আনন্দের সীমা ছিল না।

১৬ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৩
সোমবার সকাল : কলিকাতা

॥ শহরের গান ॥

শুধু পথ থেকে পথে ঘুরে বেড়ানো।

এখান থেকে সেখানে, এ পাড়া থেকে সে পাড়ায়, শহর থেকে শহরতলীতে। তবু ক্লান্তি আসে না। তবু চলার বিরাম নেই।

হারমোনিয়মটা কিষণ বয়ে চলে সারা পথ। মাঝে মাঝে লছমী তার গা ঘেঁষে চলতে চলতে বলে, এ বাবু, তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝি? এবার বাজনাটা আমায় দাও।

দূর, তুই যে মেয়েমানুষ।

তাতে কি? আমি কিছু পারি না নাকি?

পারলেও আমি সব কাজ তোকে করতে দেব না। আর হারমোনিয়মটা বইতে কিছু কষ্ট হচ্ছে না আমার বুঝলি?

লছমী হেসে বলে, কোথায় যাবে আজ?

চল না, অনেক দূরে যাব। রোদের তেজ কম আছে আজ।

নির্জন পথ ধরে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ে। জনতার কোলাহল, যান বাহনের আওয়াজে হয়তো কারোর কানে যায় না তবু কিষণের হারমোনিয়াম বেজে ওঠে। আর ওরা দুজনে এক সঙ্গে গান ধরে—

"মেরে গিরিধারী গোপাল
তোঁহে বিসরণ কই।"

ওদের দু জনের মুখে আর কোন কথা নেই। পথে পথে গান গাইতে গাইতে যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। কিষণের হারমোনিয়াম বেজে চলে সারাক্ষণ আর একটার পর একটা গান গেয়ে যায় লছমী।

তারপর ও যখন থামে তখন গলা তোলে কিষণ। অবশেষে আবার ওরা দুজনে এক সঙ্গে গাইতে গাইতে পথ চলে।

একদিকে রোজ যাওয়া চলে না। এক দিকে রোজ গিয়ে পয়সা পাওয়া যায় না। নানাদিকে গিয়ে যে রোজ কিষণের পকেট ভরে যায় তা নয়। তবু বেরুতে হয়, তবু ঘুরতে হয়, যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ততক্ষণ গলা ছেড়ে গান গাইতে হয়।

খাবারের একটা ছোট পুঁটলি থাকে লছমীর হাতে। দুপুরে ক্ষিধে পেলে জলের কলের ধারে গাছের ছায়ায় ওরা খাওয়া সেরে নেয়। তারপর পাশের কল থেকে আঁজলা ভরে জল খায় ঢকঢক করে।

একটু ক্লান্তি আসে কিষণের। মনে হয় লছমীর কোলে মাথা রেখে গড়িয়ে নিলে হয় কিছুক্ষণ। কিন্তু লছমী রাজি হয় না। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বেশি পয়সা পায়নি ওরা আজ। এখন কি শুয়ে বসে থাকবার সময় আছে। যেমন বুদ্ধি কিষণের !

এ বাবু, পুটলি বাঁধতে বাঁধতে লছমী বলে।

দাঁড়া না, দু মিনিট একটু জিরিয়ে নিই—

না না, বাধা দিয়ে লছমী বলে, একটা পয়সাও পাই নি আজ। কাল রুটির জন্য আটা কিনব কেমন করে ?

কিষণ আর কথা বলে না। হেসে উঠে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়ামের চাবি টিপে হঠাৎ কখন তান ধরে।

লছমী আর ওর সঙ্গে ইচ্ছে করেই গলা মেলায় না এখন। রোদের তেজ বড় বেশি মনে হয়। জল খেতে ইচ্ছা হয় খালি খালি। এদেশে এসে কেমন যেন অলস হয়ে যাচ্ছে ওরা। শুয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে প্রায়ই।

দিল্লীতে থাকতে পারলে হয় তো আরও অনেক বেশি রোজগার হত। দিল্লী ! লছমীর চোখ দুটো বুজে আসে। দিল্লী থেকে খুব বেশি দূরে নয় তাদের গ্রাম। শুধু তার নয় কিষণেরও বাড়ি সেখানে।

সেই গ্রাম ছেড়ে, দিল্লী ছেড়ে কিষণের সঙ্গে পালিয়ে আসে লছমী। বাবা হয় তো কোনদিনও আর তার সন্ধান পাবে না। না, কিষণকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবার কথা কল্পনা করতে পারে না লছমী।

মুখ ফুটে কাউকে একটি কথাও সে বলতে পারে নি। কারণ বললে কোন ফল হত না। কিষণকে জামাই করবার কথা তার বাবা ভাবতে পারত না কিছুতেই।

একটা লোক যে শুধু পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায় মা মরা একমাত্র মেয়েকে কোন বাপ তেমন ছেলের হাতে তুলে দেয়! তাই এক রাতে নিঃশব্দে লছমী নিজেই নিজেকে তুলে দিল তার প্রিয়তম কিষণের হাতে।

তা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করে এনেছিল মনোহর সিংএর ছেলের সঙ্গে। কি করবে তখন লছমী!

কিষণ ছাড়া সে আর কাউকে স্বামী বলে ভাবতে পারবে না। না থাক তার টাকা। না থাক তার বংশগৌরব। কিষণের মতো গান গাইবার গলা কজনের থাকে।

গানেব জন্যে সব ছাড়তে পারে লছমী। তারও অমন গান গাইতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে গুন গুন করে সে আপন মনে গান গায়। কিষণ বলেছে বিয়ের পর তাকে খুব ভাল করে গান শিখিয়ে দেবে।

বিয়ের পর! মনে মনে হাসে লছমী। বিয়ে যেন ইচ্ছে করলেই তারা করতে পারে। এতটুকু বুদ্ধি নেই কিষণের। তার বাবাকে তো চেনে না সে। ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে দুজনকে কেটে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতে সামান্য দ্বিধা হবে না তার।

কিষণ, এক সন্ধ্যে বেলা চুপেচুপে লছমী বলল, এখন কি করবে? বাবা যে আমার বিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলেছে।

তুমি কি করতে চাও বল লছমী?

আমি জানি না, মাথা নিচু করে লছমী বলল, আমি বিয়ে করব না। দুএক মিনিট কিষণ কথা বলল না তারপর হঠাৎ এক সময় লছমীর একটা হাত ধরে বলল, চল আমরা কোথাও চলে যাই ?

কোথায় ?

দিল্লী—সেখানে পথে পথে আমরা দুজন গান গেয়ে বেড়াব ?

না না, দিল্লীতে নয়। বাবা খুন করে ফেলবে তাহলে।

কিষণ কি ভেবে বলল, তবে বাংলাদেশে চল। সেখানে শুনি লোকে গানের জন্যে অনেক দাম দেয়—

লছমী বললো, যাব।

ব্যস তারপর দিল্লীর গ্রাম থেকে ওরা সটান চলে এল কলকাতার হাজরা রোডের এক বস্তিতে। একটা পয়সাও ছিল না তখন কিষণের। লছমীর গয়না বিক্রি করে এই হারমোনিয়ামটা কেনা হয়। সে অনেক দিনের কথা। সে সব কথা এখন আর লছমীর ভাল মনেও পড়ে না।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে যায় লছমীর। কিষণ কিন্তু তখনও নাক ডাকে। আহা ঘুমোক আর কিছুক্ষণ। সে তার ঘুম ভাঙায় না। বস্তিতে কিন্তু ততক্ষণে কোলাহল শুরু হয়ে গেছে। লছমী একে একে সংসারের কাজ সেরে নেয়। উনুন ধরিয়ে আটা মাখে, তারপর রুটি সেঁকে একটি একটি করে।

অবশেষে কিষণকে এসে ডাকে, বাবু, এ বাবু—

কিষণ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে, আরে, এর মধ্যেই রোদ উঠে গেল!

তার কথার জবাব দেবার সময় থাকে না লছমীর। উনুন নিবিয়ে দুটো টিনের থালা আর কয়েকটা রুটি ও একটা পুঁটলিতে বেঁধে নেয় দুপুর বেলার জন্যে।

পথে নেমে কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলেনা। কি গান গাইবে

আজ হয় তো সে কথাই ভাবে। তারপর এক সময় হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে ওঠে কিষণ।

কেউ ডাকে না এদিকে ওদের। কোন বাড়ির সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে চেঁচালে বিরক্ত হয়ে কেউ বেরিয়ে এসে হয়তো এক পয়সা ছুঁড়ে দেয়। আর মাঝে মাঝে ছেলেরা ভিড় করে।

কিন্তু কে কি দিল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কিষণ। লছমীর আগ্রহ সেদিকে। সে যত্ন করে পয়সা তুলে আঁচলে বেঁধে রাখে। গানে কিষণ যেন মনপ্রাণ সঁপে দেয়।

সবে মাত্র প্রদীপ জ্বেলেছে লছমী! অন্ধকার ঘন হয়েছে ঘরে। পয়সা গুলো গুনে গুনে সে যত্ন করে তুলে রাখল। কিষণ রাস্তার কলে গেছে হাত মুখ ধুতে। হারমোনিয়ামটা এক কোণায় পড়ে আছে। কয়েকটা আরসোলা ঘুরছে সেটাকে ঘিরে। এখন ওটার দিকে আর কেউ তাকিয়ে দেখবে না।

হঠাৎ বিরক্তি এল লছমীর। এমন করে আর চলে না। কবে যে তার কাপড় কেনবার পয়সা জমবে কে জানে! পথে পথে সারাদিন ঘুরতে হয় তাকে। এই ছেঁড়া শাড়ি পরে আর বার হওয়া যায় না।

কিষণ ফিরে আসতে লছমী বলে, ঘরে থাক এবার। ও বাড়ি থেকে দুটো গান তুলে আনি আমি। নতুন গান না শিখলে পয়সা আসবে কেমন করে বাবু!

কিষণ হেসে বলে, যা—না। জলদি আসবি। একা ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না আমি—

লছমী হালকা সুরে বলে, জলদি আসব না তো কি। বলি সেখানে কি আমার পেয়ারের লোক আছে?

কিষণ রসিকতা করে, হুঁ হুঁ।

ওরা যেখানে থাকে তার সামনেই একটা দোতলা নতুন বাড়ি।

মিষ্টি গলা ও বাড়ির বউএর। অনেক পয়সা। মোটর গাড়ি চড়ে বেড়ায় স্বামীর সঙ্গে প্রায়। লছমী ওদের দেখে আর ভাবে, কী সুখী ওরা দুজন।

বউটি এদের দুজনকে ডেকে গান শোনে মাঝে মাঝে। পয়সা দেয়। কিন্তু তার নিজের গলাও অপূর্ব। লছমী আর কিষণ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার গান শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে অনেকবার।

কিষণই বলেছে লছমীকে সেই বউটির কাছ থেকে কয়েকটা নতুন গান শিখে নিতে। পরশু সকালে তার সঙ্গে কথা বলেছে লছমী ভয়ে ভয়ে। কে জানে রাজি হবে কি-না। কে জানে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে কি-না।

কিন্তু বড় সরল মানুষ বউটি। এক কথায় রাজি হয়ে গেছে। বলেছে, লছমীর মতো গলা সে নাকি খুব কম শুনেছে। তাকে গান শেখাবার ক্ষমতা বউটির নেই। তবে কথাগুলো সে বলে দেবে আর লছমী টুকে নেবে খাতায়।

আস্তে আস্তে লছমী এসে দাঁড়ায় সাদা দোতলা বড় বাড়িটার সামনে। চারপাশে কেমন থমথমে ভাব। লছমী কাউকে দেখতে পায় না। বউটির গলাও শুনতে পায় না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে। এদিক ওদিক তাকায়।

সেই বাড়ির একটা ঝি এগিয়ে আসে, কি চাই ?

বৌদি কই ?

মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে ঝি। হঠাৎ লছমীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তারপর থেমে থেমে সব কথাই জানায় লছমীকে। বাবুর স্বভাব নাকি ভাল নয়। মদ খেয়ে প্রায়ই মার ধোর করত বৌদিকে। বাইরেও রাত কাটাত প্রায়ই। বৌদির বাবা এসে কাল জোর করে তাকে নিয়ে গেছে। কবে যে আবার ফিরে আসবে কেউ বলতে পারে না। না-ও আসতে পারে।

সেই বড় বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে যায় লছমী।

ঝিয়ের কথা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। এত বড়• বাড়ির দেয়ালের ফাঁকে যে অশান্তি আছে সে কথাটা নতুন লাগে তার।

লছমী তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসে নিজের ঘরে। শক্ত করে জড়িরে ধরে কিষণকে। ছেঁড়া শাড়ি আর হাজার অভাবের কথাও যেন ভুলে যায়।

সকাল বেলা আবার পথ!

এ বাবু, দেখনা আমার চোখে কি পড়ল?

কই? লছমীর চোখ হাত দিয়ে ফাঁক করে কোঁচার খুঁট দিয়ে ময়লা বের করতে করতে কিষণ বলে, লছমী সে গানটা মনে আছে তোর?

কোনটা বাবু?

ওই যে, বিয়ের আগে দিল্লীতে যেটা প্রায়ই গাইতিস?

ম্যয় হরি চরণনেকা দাসী?

হ্যাঁ রে, কিষণ হারমোনিয়ামে সুর তোলে, আজ ওটা গাই, তুই ধর—

গুন গুন করে সুর ভেঁজে লছমী ধরল—

"ম্যয় হরি চরণনেকা দাসী
দুঃখ কষ্ট মান অপমান
কুটিল জগত কি হাসি—"

কিষণ সুর মেলায় লছমীর সঙ্গে।

সামনে একটানা পথ! সোজা পথেই চলে ওরা।

১২ই অক্টোবর : ১৯৫৫
বুধবার সন্ধ্যা : কলিকাতা

॥ মানুষের অধিকারে ॥

লণ্ডনের শ্যাভয় হোটেল স্ট্র্যাণ্ডের ওপর। এমন অনেক ঘর আছে যার জানলা দিয়ে টেমস দেখা যায়। সেসব ঘরের ভাড়া সাধারণ ঘরের চেয়ে অনেক বেশি।

মার্কিন হোটেল। তাই সেখানে আমেরিকানের ভিড় অনেক বেশি। বড় বড় কোটিপতি, ডলার নিয়ে যারা ডাইনে বাঁয়ে ছিনিমিনি খেলে আর নামকরা চিত্রতারকা কিম্বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী আসর জমায় শ্যাভয় হোটেলের লাউঞ্জে। তাদের সেখানে দেখলে কারুর মনে হবে না যে পৃথিবীর কোথাও কোন রকম দুঃখ কষ্ট আছে।

এই হোটেলে এসে উঠলেন দিল্লীর নাম করা ধনী ব্যবসায়ী গজেন্দর সিং। তাঁর নাম উত্তর ভারতের কে আর না জানে। দু চারটি প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা তিনি। কত লোক তাঁর কাছে দিনরাত মাথা নিচু করে খোসামোদ করে, চাকরির জন্যে সাতবার সেলাম করে।

বলা বাহুল্য গজেন্দর সিংএর অধীনে লাখো কর্মচারী কাজ করে। তাঁদের সকলের মুখ চিনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি প্রতিভায় বিশ্বাস করেন। যদি কেউ নিজের প্রতিভার জোরে তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে পারে তাহলে অবশ্য তিনি তাকে স্বীকার করবেন।

মোট কথা গজেন্দর সিংএর ধারণা যে তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। সকাল থেকে রাত অবধি তাঁর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। দিল্লী থেকে বম্বে, বম্বে থেকে কলকাতা, সেখান থেকে মাদ্রাজ—মাসের মধ্যে অকেবার তাঁকে এমনি ছুটোছুটি করতে হয়। কিন্তু তাঁর ক্লান্তি আসে না, গর্বে বুক ভরে যায়।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর আপিসের প্রত্যেকটি লোক বসে আছে, তাঁর কথা বেদবাক্য মনে করে তারা যন্ত্রের মতো কাজ করছে—কেন গর্ব হবে না, প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী গজেন্দর সিংএর ?

তিনি তাঁর অধীনে আরও লোক রাখবেন, দেশবিদেশে অফিসের আরও শাখা-প্রশাখা খুলবেন। অর্থাৎ বড় হবার স্বপ্নে তিনি বিভোর। আস্তে আস্তে তিনি এত নাম করবেন যে পৃথিবী সুদ্ধ লোক তাঁকে আসতে যেতে সেলাম করবে। আজ তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁকে যেমন মেনে চলে, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর নানা দেশের লোক তাঁকে তেমনি মেনে চলবে।

অবশ্য পৃথিবীতে শত্রুপক্ষের অভাব নেই। তাঁরা গজেন্দর সিংএর নামে নানা কথা বলে। এসব নাকি তাঁর বাবা করে গেছেন। তাঁর অবর্তমানে গজেন্দর শুধু বাবার গদিতে বসে মাতব্বরি করছেন। মন্দ লোকে যা খুশি বলুক, এসব কথা গজেন্দর সিংএর কানে যায় না। কানে গেলেও ছোট তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁর নেই। যারা এসব কথা বলে, তারাই নির্লজ্জের মতো তাঁর কাছে নানা সুবিধা নিতে আসে। চাকরির জন্যে ধরে কিংবা অর্থ সাহায্য চায়। তাই এসব লোককে মানুষ বলে ধরেন না দিল্লীর প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী গজেন্দর সিং।

সেই গজেন্দর সিং বিলেতে বেড়াতে এলেন। ইচ্ছে ছিল সারা ইউরোপ ঘুরে আমেরিকার দিকে পাড়ি দেবেন। এই দুই মহাদেশের আপিসে কাজের ধরন সম্বন্ধে নানা খবর সংগ্রহ করে দেশে ফিরে নিজের আপিসের শাখা-প্রশাখায় তেমনি ধরনের প্রচলন করবেন।

গজেন্দর সিংএর বিলেতে আসবার ইচ্ছে অনেক দিনের। কিন্তু নানা কারণে আসতে পারেন নি। প্রথমত তিনি সেই আমলের ঘোর স্বদেশী লোক। ছেলেবেলা থেকে গান্ধী টুপী আর খদ্দর পরে মানুষ হয়েছেন। পরবর্তী জীবনেও তার ইচ্ছা ছিল দেশপ্রেমিক বলে নাম কেনবার। তাঁর বাবা তাঁর কানে এ মন্ত্র দিয়ে গেছেন।

সেই কারণে ব্রিটিশ আমলে বিলেতে আসবার ইচ্ছে প্রকাশ করতে তাঁর কোথায় যেন বেধে গিয়েছিল। সে বাধা দূর হল ভারতে বৃটিশ রাজত্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ইচ্ছে হলেই সময় হয় না। কত কাজ তাঁর। বিলেত যাওয়া-আসা তো দুচার দিনের ব্যাপার নয়। একবার গেলে ভাল করে দেখে আসতে হয়। না হলে খবরের কাগজ ওয়ালাদের তিনি কি বিবৃতি দেবেন। আর ইউরোপ গেলে আমেরিকা না দেখে ফেরা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। জীবনে আর কবে দেশ ছাড়বার সময় হবে কে জানে। হয় তো এ জীবনে আর সময় হবে না।

এমনি ভাবতে ভাবতেই দু চার বছর গেল। তবু আনন্দ হয় গজেন্দর সিংএর—একথা ভাবতে তাঁর ভাল লাগে যে ইচ্ছে মতো দেশ ছাড়বার তার উপায় নেই। তাঁর নির্দেশ না হলে কেমন করে কর্মচারীরা কাজ চালাবে ভেবে পায় না।

গজেন্দর সিংএর মনের এই অবস্থার কথা মাত্র একটি লোক জানত। সে তাঁর বাপের আমলের বুড়ো মাস্টার। মাস্টার সাহেবের তিনকূলে কেউ নেই। এ বাড়ির অন্নে সে মানুষ। ছেলেবেলা থেকে গজেন্দরকে পড়িয়েছে, ইচ্ছে ছিল তাঁর ছেলেদেরও পড়াবে। কিন্তু আশ্চর্য বিয়ে করবারও সময় পেলেন না গজেন্দর। কাজ ছাড়া তিনি কিছু জানেন না।

শুধু মাস্টার সাহেবের সাত খুন মাপ। সে যখন ইচ্ছে গজেন্দরের সঙ্গে দেখা করতে পারত, তাঁকে যা খুশি বলতে পারত, নানা রকম রসিকতা করবার অধিকারও তাকে দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু মাস্টার সাহেব কয়েক বছর ধরে লক্ষ করছে যে গজেন্দর তার সব রসিকতা ঠিক পছন্দ করেন না। তাকে যেন এড়িয়ে যেতে চান। বুড়ো মাস্টারের বুঝতে দেরি হয় না যে গজেন্দর পদমর্যাদার কথা ভেবে মাস্টার আর তাঁর মাঝখানে একটা প্রাচীর রাখতে চান। যখন তখন তাঁকে যা তা বলা একেবারেই পছন্দ করে না।

না করুন—তাতে মাস্টার সাহেবের কিছু যায় আসে না। .তাকে গজেন্দর যদি তাড়িয়ে দেয় সে চলে যাবে। এখানে সে তাঁরই জন্যে থেকে গেছে। বাড়িতে আরও নানা পুষ্যি আছে, মাস্টার সাহেব তাদের দেখাশোনা করে।

হাজার হলেও বুড়ো মানুষ, ছেলেবেলা থেকে গজেন্দরকে মানুষ করেছে। তাই আজ তিনি তার দিকে যেমন ভাবেই তাকান না কেন, সে কিছু গ্রাহ্য করে না।

গজেন্দর যতই নাম করুন না কেন, মাস্টার জানে তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ লোক। পরমাত্মীয় মনে করে যদি কেউ তাঁর দেখাশোনা না করে তাহলে গুমরে গুমরে তিনি শেষ হয়ে যাবেন। এতদিন মাস্টার সাহেব সে কাজ করে এসেছে। এবং সুযোগ পেলে তাঁকে সময়ে অসময়ে নানা কথা বুঝিয়েছে।

গজেন্দর, তাঁর লম্বা চেহারার দিকে তাকিয়ে মাস্টার সাহেব অনেকবার বলেছে, বড় রোগা হয়ে যাচ্ছ, এবার একটু নিজের দিকে তাকাও, এত পরিশ্রম তোমার সহ্য হবে না।

গজেন্দর একটু অবাক হয়ে মাস্টার সাহেবের দিকে কঠিন দৃষ্টি হানলেন। কেউ যে তাঁকে এমন সহজে নাম ধরে ডাকে তা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না।

তাঁকে আজকাল নাম ধরে ডাকবার সাহস কার। কিন্তু মুশকিল এই যে মাস্টার সাহেবকে মুখের ওপর কিছু বারণ করতে আজও তাঁর কোথায় যেন বেধে যায়। সেই ছেলেবেলার জের আজও চলেছে।

দেখুন মাস্টার সাহেব, পাইপে একটা দীর্ঘ টান মেরে মাস্টারের দিকে তাকিয়ে গজেন্দর উসখুস করতে লাগলেন।

কি? কিছু বলবে? মাস্টার সাহেব উঠে এসে গজেন্দর সিংএর ঘাড়ে পরম স্নেহে একটা হাত রেখে জিজ্ঞেস করল।

নিতান্ত অবহেলা ভরে তার হাত সরিয়ে গজেন্দর বললেন,

আপনি বস্থন। আর ভবিষ্যতে আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলবেন না, আমি সকলের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করা পছন্দ করি না।

মাস্টার সাহেব চোখে মুখে প্রচুর বিস্ময় নিয়ে তিন পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, গজেন্দর, তুমি আমার সঙ্গে এমন স্থরে কথা বলছ কেন ?

আমি তো বললাম যা বলবার, পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে গজেন্দর বললেন, আপনি একটু বুঝে শুনে চলবেন, মানে আমাকে নাম ধরে ডাকা, এসব কমিয়ে দেবেন। বুঝতেই তো পারেন, আজ আপনার সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ—

পারি, মাস্টার সাহেব কাঁপতে কাঁপতে বলল, কিন্তু আমি যে ছেলেবেলা থেকে তোমাকে পড়িয়েছি, তোমাকে এইটুকু দেখেছি, এখন কেমন করে তোমাকে—

ব্যস্ ব্যস্, একটা বিকট আওয়াজ করে গজেন্দর বললেন, আপনি বলতে চান যে এখন আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মান দেয়াও আপনার পক্ষে সম্ভব নয় ?

না না, আমি যে তোমাকে স্নেহ করি গজেন্দর, তোমাকে ছেলের মতো ভালবাসি—

বাধা দিয়ে গজেন্দর সিং বললেন, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি বাড়ির সামান্য একজন শিক্ষক মাত্র। আপনি তো অনেক কিছুই চাইবেন। কিন্তু আমার পক্ষে আপনাকে এত অন্তরঙ্গ মনে করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনি সতর্ক হবেন।

গজেন্দর, তোমার কথায় আমি বড় দুঃখ পেলাম—

আপনি এখন যেতে পারেন, আমার কাজ আছে। আর যা বললাম, মনে রাখবেন। আমাকে যেন আবার এসব সম্বন্ধে কোন কথা বলতে না হয়।

মাস্টার সাহেব আস্তে আস্তে গজেন্দর সিংএর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। না বললেও চলে যে এ বাড়ির মায়া কাটিয়ে শিগগির সে অন্যত্র চলে গেল।

কিন্তু এ ব্যাপারের জন্যে গজেন্দর সিংএর মনের কোথাও কোন দুঃখ কিংবা গ্লানি রইল না। কেনই বা থাকবে, সব চেয়ে আগে তাঁর দম্ভ। যারা তাঁর সমুচিত মূল্য দিতে কার্পণ্য করবে, তাদের সঙ্গে তিনি ঠিক এমনি ব্যবহার করবেন, এমনি করে বুঝিয়ে দেবেন তাদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কোথায়।

গজেন্দর সিং জানেন তাঁর জীবন থেকে এমনি করে অনেককে সরে যেতে হবে। যায় যাক, সকলের পরিবর্তে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাঁর দম্ভ, সাধারণ মানুষের মতো মধ্যবিত্ত মনোভাব নিয়ে চলাফেরা করা তাঁর সাজে না।

তিনি শুধু অসাধারণ মানুষ নন, তিনি উত্তর ভারতের এক ডাকে চেনা লোক। ছোটোখাটো মানুষের ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার তাঁর সময় নেই।

সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে লণ্ডনের শ্যাভয় হোটেলে উঠেও নিজের পদমর্যাদার কথা গজেন্দর এক মুহূর্তের জন্যেও ভুললেন না। বরং সেকথা এক বিদেশিনীকে কঠিন স্বরে শুনিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আর সেখান থেকেই এ গল্পের আরম্ভ।

শ্যাভয় হোটেলের এক ওয়েট্রেসের নাম ব্রেণ্ডা। রোগা ছিমছাম চেহারা। চোখে মুখে যেন দুষ্টুমি উপচে পড়ছে। গজেন্দের সিং এর ঘর দেখাশোনার ভার পড়ল তার ওপর।

ব্রেণ্ডার বয়স অল্প আর গজেন্দরও বুড়ো নয়। কাজেই ব্রেণ্ডা ভাবল, বড়লোক ব্ল্যাকম্যানটাকে একবার বাজিয়ে দেখা যাক না কতদূর অগ্রসর হয়। সে তো আরও অনেক ভারতীয় এই হোটেলে দেখেছে। তারা অবশ্য তার জন্যে নাকি জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু শেষ অবধি তা কেউ দেয়নি, কাজ শেষ করে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছে। তার জন্যে ব্রেণ্ডার এতটুকু দুঃখ নেই, কালো লোকের

জীবন নিতে সে চায়ওনি, সে যা চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে। অর্থাৎ তারা তার জন্যে প্রচুর খরচ করেছে, থিয়েটার বায়োস্কোপ থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রতীর অবধি বেড়াতে নিয়ে গেছে। তার ইংরেজ বন্ধুবান্ধবের এত করবার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ নেই। তাই ভারতীয়দের ঘর তদারক করবার ভার পেলে ব্রেণ্ডা খুশি হয়। এবং গজেন্দর সিং শ্যাভয় হোটেলে ওঠবার পর বোধ হয় সব চেয়ে বেশি আনন্দ তারই হল কিন্তু ভুল ভাঙল একদিন সকালে। আর নিদারুণ অপমানে তার রক্ত গরম হয়ে উঠলেও কিছু বলবার মুখ রইল না, কেননা চাকরি যাবার ভয় আছে।

গজেন্দর সিংএর ব্রেকফাস্ট টেবিলে রেখে বেশ অন্তরঙ্গ স্বরে ব্রেণ্ডা হেসে বলল, কতদিন থাকা হবে?

কেন? কঠিন কণ্ঠে গজেন্দর বললেন, আমার সঙ্গে বাজে কথা বলবে না, জান আমি কে?

ভয় পেয়ে ব্রেণ্ডা বলল, না তো, কে আপনি?

তোমাকে সেকথা জানাবার প্রবৃত্তি আমার নেই, তোমাদের ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নিও, সে নিশ্চয়ই খবর রাখে।

এতক্ষণ পর যেন দিশা ফিরে পেয়ে ব্রেণ্ডা বলল, অত খবর জানবার আমার কোন দরকার নেই, আমি শুধু ভদ্রতার খাতিরে আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম মাত্র—

বাধা দিয়ে গম্ভীরভাবে গজেন্দর সিং বললেন, আমার সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলবে না। ভুল না আমি ভারতবর্ষের নাম করা ধনী ব্যবসায়ী গজেন্দর সিং।

তাতে আমার কি, আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে মুখে বিরক্তির সুস্পষ্ট ছাপ নিয়ে ব্রেণ্ডা বেরিয়ে গেল।

আর গজেন্দর গজ গজ করতে করতে ভাবছিলেন যে তাকে ডেকে দুই দাবড়ানি দেবেন কিনা। সাহেবদের দেশে প্রথমবার এলেও তার এতটুকু জড়তা নেই।

শ্যাভয় হোটেলের বাসিন্দারা প্রায়ই লাউঞ্জে ভিড় করে আসর সরগরম করে তোলে। বিকেলে চায়ের আগে কিম্বা রাত্রে ডিনারের পরে।

সেদিন নানা ধরনের লোক লাউঞ্জে বসে চা পর্ব শেষ করছিল। তাদের মধ্যে শুধু একজন ভারতীয়, তিনি আমাদের গজেন্দর সিং। কিন্তু তাঁর নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে, এখানে এদের মধ্যে হঠাৎ যেন বেশ বেমানান। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলছে না, তিনিও কারোর সঙ্গে কথা বলবার সাহস পাচ্ছেন না। তাদের আলোচনা কানে এলেও গজেন্দর সিংএর যেন তাদের ভাষা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে ওরা তাঁর দিকে তাকাচ্ছে আর অস্বস্তিতে গজেন্দর সিংএর মন ভরে যাচ্ছে।

এই দু চার দিনের মধ্যে গজেন্দরএর ধারণা অনেক বদলে গেছে। মানে তিনি যা আশা করেছিলেন তা পাননি, জোর করে আদায়ের চেষ্টা করে নানা জায়গায় অপদস্থ হয়েছেন।

আর এখন তাঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে এদেশে আর একদিনও থাকতে চান না। যেখানে কেউ তাকে চেনে না, জানবার চেষ্টা করে না তিনি কে, বিশেষ সম্মানও দেয় না, সে-পোড়া দেশে থেকে নষ্ট করবার মতো সময় তাঁর মতো লোকের নেই।

এসব কথা মনে এলেও গজেন্দর সিংএর আসল কথা জানবার তখনও বাকি ছিল। আর সে কথাটা সেদিন লাউঞ্জে একা বসে তিনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারলেন। তারপর তাঁর মনে হল—কি মনে হল সেকথা বলে শেষ করি।

এই হোটেলে এ সময় যারা এসেছে তারা আমেরিকার নামকরা ধনী। কয়েকজন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীও আছে। এই দুই দেশের ধনিকরা এক হয়ে কি একটা বড় ব্যাপার ঘটাতে চান, তাই তাঁদের এই যোগাযোগ।

গজেন্দর সিং একথা জানতেন। তাঁর মনে আশা ছিল যে

তিনিও যে ভারতবর্ষের একজন ধানিক সেকথা এরা জানবে আর তাদের দলে তাঁকেও টেনে নিয়ে নানা আলোচনা করবে।

কিন্তু যথাসময়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর সম্পর্কে এদের কোন কৌতূহল নেই। তিনি যত বড় ধনী হোন না কেন, আমেরিকা আর ব্রিটেনের তাঁর মতো অবস্থার লোকের সঙ্গে তাঁর তফাৎ অনেক। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো অর্থবল তাঁর নেই। আর সব চেয়ে বড় কথা তিনি ভারতীয়, তাই অর্থবান হলেও এদের কাছে তিনি শাসিতের জাত ছাড়া আর কেউ নন। এত কথা গজেন্দর বুঝেছিলেন ব্রিটিশ ধনিক লর্ড বেলীর সঙ্গে আলাপ করে। তারপর গায়ে পড়ে অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে তাঁর ঘুচে যায়। অপমানে তাঁর বুক জ্বলে গেল। তাই শান্তি পাবার জন্যে তিনি ঘরে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হলেন।

লাউঞ্জে একের পর এক আলো জ্বলে উঠেছে। টুং টুং করে বাজনা বাজছে। চা, সরবৎ আর নানা রকম পানীয়র ট্রে হাতে নিয়ে ওয়েট্রেসরা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। আমেরিকানদের কোন দিকে চোখ দেবার সময় নেই, তারা প্রাণ খুলে হল্লা করছে।

গল্প করবার লোক প্রত্যেকের আছে। শুধু গজেন্দরের যেন এই পৃথিবীতে কেউ নেই। তিনি যেন একেবারে নিঃসঙ্গ। জীবনে বোধ হয় এই প্রথমবার তাঁর নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। দুটো কথা বলবার জন্যে তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় এখানে কারোর নেই। তারা গজেন্দরকে লক্ষ করছে। যারা দেখছে তারা নিতান্ত অবহেলা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

সমস্ত ভুলে অকস্মাৎ আস্তে আস্তে গজেন্দর লর্ড বেলীর কাছে এগিয়ে গেলেন। একমাত্র তিনিই একা বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন।

আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম—

গজেন্দরএর কালো রঙের দিকে দুএক মিনিট অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে লর্ড বেলী বললেন, তুমি কি বলতে চাও?

মানে আমি এই, আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে চাই, আমি আমাদের দেশের একজন নামকরা ধনী।

তোমার দেশ কোথায়? আফ্রিকা?

না, ইণ্ডিয়া।

ওই একই হল। কিন্তু তোমার সঙ্গে গল্প করবার আমার বিশেষ সময় হবে না, আমার কাছে এখুনি লোক আসবে, বেরোতে হবে। নিঃসঙ্গ বোধ কর তো ইণ্ডিয়া হাউসে যাও না, সেখানে তোমার দেশের অনেক লোকের দেখা পাবে—

গজেন্দর সিংএর যেন কি হয়েছে! তিনি বুঝতে পারছিলেন যে লর্ড বেলী তার সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করছেন না, তবু কী দুর্বার আকর্ষণে তিনি যেন তাঁর সঙ্গে আরও কথা বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

গজেন্দর পাইপে টান মেরে বললেন, আমার দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে মেশবার জন্যে আমি ব্যস্ত নই, আর তারা আমার যোগ্য বন্ধু নয়—

অবাক হয়ে লর্ড বেলী জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

কারণ তারা সবদিক থেকে আমার চেয়ে অনেক ছোট, তারা কেবলই নানাভাবে আমার কাছে সাহায্য চায়—

ভালই তো, তোমার নিজের দেশের লোককে তুমি সাহায্য না করলে আর কে করবে?

ঠিক কথা, গজেন্দর এক মিনিট কি ভেবে বললেন, আমি সব সময় তা করে থাকি। কিন্তু আপনিও ইংল্যাণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ শিল্পবীর, আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে যারা সাহায্য চায়, আমার কৃপা কামনা করে, তারা আর যাই হোক, আমার বন্ধুত্বের দাবী করতে পারে না। গজেন্দর থেমে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তাই আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি—

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কি বলতে চাচ্ছ ?

মানে, আমাকে আপনি যদি বন্ধু মনে করেন তাহলে খুশি হব।

লর্ড বেলী বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার কথায় সায় দিতে পারলে আমিও খুব খুশি হতাম। কিন্তু আমাদের দেশের নিয়ম কানুন একটু আলাদা, বন্ধুত্ব এখানে কেউ এমন ভিক্ষে করে পায় না।

কিন্তু আমি আপনার ব্যবসায়ে নানা সাহায্য করতে পারি। ধরুন, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি যদি ভারতবর্ষে কোন শাখা খোলেন—

গম্ভীর হাসি হেসে লর্ড বেলী বললেন, ভারতবর্ষে ব্যবসা করবার আমার কোন ইচ্ছে নেই, সে-দেশের লোক তো খেতে পায়না শুনি। আমেরিকার ব্যবসা করবার জন্যে আমি এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ সে-বিষয়েও আমি আপনাকে নানা সাহায্য করতে পারি, এমন কি, একটা মোটা টাকা দিয়ে আপনার সেই ব্যবসার অংশ কিনতে পারি।

ধন্যবাদ, তোমার সাহায্য নেবার আমার কোন দরকার নেই। তুমি এদেশে নতুন এসেছ তাই বোধ হয় জান না কার সঙ্গে কি কথা বলছ—যা হোক আমি এখন ব্যস্ত আছি, আমার সময় বড় অল্প— লর্ড বেলী উঠে দাঁড়িয়ে গজেন্দরকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে আর কথা বলতে তিনি একেবারে অনিচ্ছুক।

এমনি করে আরও দুএক জনের কাছ থেকে আঘাত খেয়ে গজেন্দর বুঝতে পারলেন এদের মধ্যে তিনি কেউ নন, কিছু নন। তিনি কালো লোক, তিনি অন্য দেশের লোক, এরা তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থবান তাই তারা যেন তাঁকে কৃপার চোখে দেখছে আর তাঁর কথা শুনে বোধ হয় বিদ্রূপের হাসি হাসছে। এরা কেউ তাকে স্বীকার করবে না, শ্রদ্ধা করবে না।

নিজের দেশের কথা অকস্মাৎ মনে পড়লো তাঁর। যাঁরা তাকে স্বীকার করেছে, শ্রদ্ধা করেছে, আত্মীয় মনে করে ভালবেসে কাছে

এগিয়ে এসে সেবা করতে চেয়েছে, তিনি তাদের দুই হাত দিয়ে ঠেলা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, মানুষ বলে মনে করতেও বেধে গেছে। আজ তাদের কাছে ছুটে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হল তার। এক আশ্চর্য দৃষ্টি যেন খুলে গেছে। আজ আর কাউকে ছোট বলে মনে হচ্ছে না। গজেন্দর সিং মনে মনে হঠাৎ যেন অনেক বড় হয়ে উঠলেন।

সেই ওয়েট্রেসের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। কী ছেলেমানুষী করেন যে তিনি। একজন বিদেশিনী, তা সে যেই হোক না কেন, মিষ্টি করে কথা বললে তাঁর মান যাবে কেন! ব্রেণ্ডার সঙ্গে একটু ভাল করে কথা বলতে হবে।

তার চেহারার কথা মনে হতে একটু উসখুস করতে লাগলেন গজেন্দর সিং। মেয়েটি নিজেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল। একজন সঙ্গিনীর অভাব তিনি ভীষণভাবে বোধ করছেন এখন। ব্রেণ্ডার সঙ্গে একটু ঘুরে এলে ক্ষতি কি, এখানে তাকে তো আর কেউ চেনে না, কারোর চেনবার সম্ভাবনাও নেই।

নিজের ঘরে এসে একটু ইতস্তত করে বেল বাজালেন গজেন্দর। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেণ্ডা এসে দাঁড়াল। বেশ সেজেগুজে আছে। দেখলে কে বলবে ওয়েট্রেস। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল গজেন্দর সিংএর।

ব্রেণ্ডা যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি বলছেন স্যার?

মৃদুস্বরে গজেন্দর উচ্চারণ করলেন, তুমি কি এমন ব্যস্ত আছ?

কেন?

তোমার ছুটি হবে কখন?

আর ঠিক এক ঘণ্টা পর, কেন বলুন তো স্যার?

চল না আমরা দু জন এক সঙ্গে কোথাও গিয়ে একটা ছবি দেখে আসি?

গজেন্দরএর কথা শুনে ব্রেণ্ডা এত বেশি অবাক হল যে সে

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। পরে মনে মনে লোকটির মস্তিষ্ক সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল।

গজেন্দর এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে মিনতি করে বললেন, যাবে ?

হাত সজোরে ছাড়িয়ে নিল ব্রেণ্ডা, এমন ব্যবহার সকলের কাছে থেকে আমি আশা করিনা। ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। লর্ড বেলীর ছেলের সঙ্গে আজ আমি ছবি দেখতে যাচ্ছি, একটু হেসে ব্রেণ্ডা জিজ্ঞেস করল, লর্ড বেলীর নাম আপনার মতো ধনী লোকের নিশ্চয়ই অজানা নেই ?

গজেন্দর মাথা নাড়লেন।

তারই ছেলের সঙ্গে আমি যাচ্ছি আজ। আর আপনি আমাকে এসব আজে বাজে কথা বলবার জন্যে কখনও ডাকবেন না, কেননা কালো লোকদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করা আমি মেনে নিতে পারি না, গজেন্দরকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে সে-ঘর থেকে আস্তে আস্তে ব্রেণ্ডা বেরিয়ে গেল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে সে-ঘর। তবু আলোর সুইচ টিপলেন না গজেন্দর। রাজ্যের লজ্জা গোপন করবার জন্যে তিনি যেন এই অন্ধকারে অনেকক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান।

২৮শে অগস্ট : ১৯৫৪
শনিবার রাত্রি : কলিকাতা

॥ গ্রেপ্তার ॥

একদিন যে ধরা পড়বে না তা নয়। শেষ অবধি কোন চোর ধরা পড়ে না। কিন্তু তা নিয়ে ভাবনা করে লাভ নেই এখন। তার এখনও অনেক দেরি আছে।

সুরেশ ভাল করে গুছিয়ে নেবে সব কিছু। তবু থেকে থেকে তার দামিনীর কথা মনে পড়ে যায়। আর পুকুরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ সে চুপ করে বসে থাকে।

একটা পুকুর আছে এ পাড়ায়। একটা নয়, টালিগঞ্জে দু তিনটে পুকুর আছে। তা থাক। পুকুরের হিসেব রাখে না সুরেশ। পুকুর দেখলেই সে ভয় পায়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। মাঝে মাঝে চোখের জলও গোপন করতে পারে না হয় তো।

ওই পুকুরে দামিনী একদিন ডুবে মরেছে। লোকে সুরেশকে দোষ দেয়। সে-ই নাকি স্ত্রীকে পুকুর দেখিয়ে ওখানে ডুবে মরতে বলেছিল।

ঝগড়ার সময় পুরুষ মানুষ কি না বলে। তা বলে সেকথা সত্যি মনে করতে হবে? ধন্য মেয়েমানুষের বুদ্ধি। দামিনীর কথা মনে করে হাসি পায় সুরেশের।

কিন্তু সত্যি দামিনীর কোন দোষ ছিল না। সুরেশেরও নয়। তাহলে কার দোষ? আজও সুরেশ সেকথা ভেবে পায় না। তবে আর মরতে বলে না কাউকে। সেকথা আর কোনদিন যেন তাকে উচ্চারণ করতে না হয়। তাই ভালভাবে সুরেশ গুছিয়ে নিতে চায়। নিজেও অনাহারে মরতে চায় না।

অবশ্য দামিনীর কথা ভুলে গেছে পাড়ার লোক। আজ কেউ আর কোন প্রশ্ন করে না সুরেশকে। সে শুধু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে—কার জন্যে মরল দামিনী ?

কয়েক বছর আগেকার কথা তার মনে পড়ে যায়।

দুই মেয়ে সুরেশের। কামিনী আর দামিনী। পাকিস্থান থেকে প্রায় এক বস্ত্রে ওরা এসে উঠল টালিগঞ্জের কলোনিতে। সরকার একটা ব্যবস্থা করেছিল বটে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় এত লোককে নিয়ে সংসার চলে না। দুবেলা খাওয়াও জোটে না পেট ভরে।

দামিনী কাকে যেন অভিশাপ দেয় আর সারাদিন চোখের জল ফেলে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না সুরেশ। কি বলবে সে ?

যা হয় কর, নিজেরা না খেয়ে থাকতে পারি, দামিনী গজ গজ করে, কিন্তু মেয়ে দুটোর কি হবে ?

হবে আবার কি ? বিরক্ত হয়ে সুরেশ বলে, বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। ভদ্রভাবে বাস করা চলবে না এখানে। দেখ না পাড়ার অন্য মেয়েরা কেমন সেজেগুজে সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে যায় ?

কোথায় যায় ?

পয়সা রোজগার করতে গো।

কথার ছিরি কি তোমার ! কেমন বাপ গো তুমি ! মরণও হয় না মেয়ে দুটোর।

মরবে কেন ? বালাই ষাট !

বলি, না হলে বাঁচবে কেমন করে ?

ওদের বাপ ভাববে সেকথা—

সুরেশ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দামিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে না।

কিন্তু কথা না বললেই অভাবের হাত এড়ান যায় না। কোন যুক্তি তর্ক চলে না সংসারের কাছে ! প্রত্যহ নানা দাবী পেশ করে সংসার।

আর চাকরি খোঁজার নাম করে সুরেশ পালিয়ে বেড়ায়। অভাবের আগুনে জ্বলে পুড়ে তাকে এতটুকু সমবেদনা জানায় না কেউ।

দামিনী বলে, সে অক্ষম। এই কলোনির আর কেউ ওর মতো বেকার হয়ে বসে নেই। মেয়ে দুটো বাপকে একেবারে মানেনা। যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। দামিনীও বাধা দেয় না তাদের।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে চিৎকার করে উঠল সুরেশ, বলি হ্যাঁ গা, কামিনী কই? •

দামিনীও গলা তুলে বলল, অমন চেঁচাও কেন? খুন করবে নাকি?

হ্যাঁ খুন করব। কোথায় তোমার আদুরে দুলালী কামিনী?

আমি কি জানি? এই তো বার হল—

শক্ত করে দামিনীর হাত ধরে সুরেশ বলল, ব্যবসা করতে বার হল, য়ঁ্যা? কেমন মা তুমি? মেয়েদের সাজিয়ে গুজিয়ে বাইরে পাঠাতে লজ্জা করে না তোমার? দুটো ছোকরার সঙ্গে এমনভাবে লেকের ধারে বসে আছে যে তাকান যায় না ওর দিকে—

উঃ, মুখভঙ্গি করে দামিনী, কী আমার ম্যাজিস্টর বাপ রে! খেতে দিতে পারে না মেজাজ—

থাম। হিন্দুর মেয়ে না তুমি? না হয় না খেয়ে থাকতে সারা জীবন—তা বলে মেয়েকে অধঃপাতে দেবে?

কে দিয়েছে, আমি না তুমি? বিয়ে দেবার ক্ষমতা নাই, মুখে বড় বড় কথা। দুটো ছেলের সঙ্গে কথা বলেছে তো জাত গেছে। বলি সাধ আহ্লাদ নাই সোমত্ত মেয়ের?

দামিনীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল সুরেশ। এর আগে সে বুঝতে পারেনি এই ক মাসে এত পরিবর্তন হয়েছে তার। ইচ্ছে হল দামিনীকে খুন করে ফেলে। তার দিকে তাকাতে ঘৃণা হচ্ছিল সুরেশের।

আবার চিৎকার করে সে বলল, মা নাকি তুমি? ডাইনি একটা—বুঝলে?

আর তুমি কি?

মর তুমি। তুমি না মরলে মেয়ে দুটো নষ্ট হয়ে যাবে—তুমি না মরলে সংসারে লক্ষ্মী আসবে না কখনও, উত্তেজিত স্বরে সুরেশ বলে চলল, যেদিন সংসারে এনেছি সেইদিনই মাকে খেলে। ডাইনি না তো কি তুমি? তোমার জন্যে অমন সোনার ঘর ছেড়ে ভিখিরির মতো এখানে আসতে হল—যাও ওই পুকুরে ডুবে মর। আমার সংসারে অবার লক্ষ্মী আসবে তাহলে—

আশ্চর্য! সুরেশের কথা শুনে সত্যি পুকুরে ডুবে মরল দামিনী। এত কম বুদ্ধি কেন ছিল তার? সে কি তাকে সত্যি মরতে বলেছিল। রাগ হলে কি না বলে পুরুষ মানুষ? কিন্তু সেকথা বোঝে কোন স্ত্রী? এত দুঃখেও হাসি আসে সুরেশের।

যা হোক, দামিনী মরল। কিন্তু দুই মেয়ে নিয়ে সুরেশকে বাঁচতে হবে। শুধু চাকরি খোঁজবার বৃথা চেষ্টা করে দিন চালান যাবে না। মেয়েদের আর কিছু বলে না সে। তাদের কাছে সে যেন মস্ত অপরাধ করেছে। কামিনী কথা বলে না তার সঙ্গে, শুধু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। সুরেশ বুঝতে পারে দামিনীর মৃত্যুর জন্যে মেয়েরা তাকেই দায়ী করে। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে সে মান বাঁচায়।

একদিন অনেক দেরি হল বাড়ি ফিরতে সুরেশের। কিছু টাকা ধার দেবে বলেছিল একজন। দক্ষিণ কলকাতায় তার বাড়ি। যেতে আসতে সময় লাগে অনেক। কিন্তু যাওয়া আসাই সার হল সুরেশের। টাকা ধার পাওয়া গেল না।

বাড়ি আসতেই ছোট মেয়ে যামিনী কাছে এসে দাঁড়াল, বাবা?

কি মা?

মানে—

বল না?

একটু ইতস্তত করে দু বার ঢোঁক গিলে যামিনী বলল, দিদি আর ফিরবে না বাবা—

চমকে উঠে সুরেশ জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে কামিনীর?

বিয়ে করেছে বাবা—

কবে? কখন? কাকে?

কাজলদাকে। লেকের ধারে বাড়ি। খুব বড় লোক। দিদি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে—

কোথায় গেছে জানিস?

দিল্লী চলে গেছে বাবা। আমাকে বলে গেছে, বাবাকে বলিস আমার ওপর যেন রাগ না করেন। ব্রাহ্মণ হলেও কাজলদা খুব ভাল লোক। মাসখানেক পর দিদি কলকাতায় ফিরবে। তখন তোমাকে ওরা প্রণাম করতে আসবে। সব দায় যেন যামিনীর। সুরেশকে মিনতি করে সে বলল, লক্ষ্মী বাবা, দিদির ওপর তুমি রাগ কর না—

না রাগ করব কেন? ম্লান হাসল সুরেশ, মেয়ের বিয়ে হলে কোন বাপ রাগ করে? এবার তুইও অমনি একজনকে খুঁজে নে রে যামিনী। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না তোদের জন্যে—

আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি চলে গেলে তোমার দেখাশুনো করবে কে?

যামিনীর কথা শুনে চোখে জল জমে ওঠে সুরেশের। মেয়ের পিঠে হাত দিয়ে মৃদু স্বরে সে বলে, পাগলি!

বাবা, যামিনী সুরেশের আরও কাছে সরে দাঁড়াল।

কি বল না?

কি খাবে বাবা?

কেন রে? বাড়িতে কি কিছুই নেই?

না, রুদ্ধ হয়ে এল যামিনীর কণ্ঠস্বর।

তুই কি খাবি মা ?

আমি ? মাথা নিচু করে যামিনী বলল, রাতে আমি তো কিছু খাই না বাবা।

বলিস কি ? উপোস করিস ?

হ্যাঁ—

সুরেশ এবার বিস্মিত হয়ে যামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক দামিনীর মতো দেখতে—তার স্ত্রীর মতো। এ মেয়েকে সুরেশ কিছুতেই না খেয়ে থাকতে দেবে না। একটা উপায় করতেই হবে তাকে। এমন করে আর দিন চালান যাবে না।

ভাবিস না যামিনী, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কি হবে ?

যেমন করে হোক রোজগার আমি করবই।

কিন্তু আজ তুমি কি খাবে ?

কিছু না, সুরেশ বেশ জোর দিয়ে বলল, আজকের রাতটা যে করে হোক চালিয়ে দে মা, কাল থেকে আর ভাবতে হবে না তোকে।

কি করবে তুমি ?

সুরেশ হেসে বলল, দেখিস তখন।

যামিনীর চোখে জল আসছিল। আর কোন কথা না বলে সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেল।

বেশ রাত হয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে সিরসির করে। পুকুরের ধারে এসে সুরেশ থমকে দাঁড়াল। কিন্তু বেশিক্ষণ এমন করে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল নয়, কেউ সন্দেহ করলেই মুশকিল। শেষ টান দিয়ে পুকুরের জলে সুরেশ বিড়ি ফেলল।

দত্তদের বাড়ির দিকে আগে যাওয়া যাক। আজ পয়লা তারিখ। ও বাড়ির বড় ছেলে মাইনে পেয়েছে। চারপাশ অন্ধকার। পাড়া একেবারে নিস্তব্ধ। উড়ে পানওয়ালাও দোকান বন্ধ করেছে।

না, এখন সহজে কেউ দেখতে পাবে না তাকে। সকলের চোখে গভীর ঘুম নেমে এসেছে। তবু সুরেশকে জেগে থাকতে হবে—বেঁচে থাকতে হবে তাকে। যামিনীর বিয়ে দিতে হবে। ঘুমিয়ে থাকলে চলে সুরেশের ?

দত্তদের বাড়িটা বেশ বড়। সুরেশ এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে। কে কোন ঘরে থাকে সে জানে। বড় ছেলে থাকে একেবারে সামনের ঘরে।

জানলা খোলা ছিল। উঁকি মেরে সুরেশ কাউকে দেখতে পেল না। মশারি টাঙান রয়েছে। ঘর অন্ধকার। ইচ্ছে করলে ভেতরে প্রবেশ করা যায়। খড়খড়ির ভেতর দিয়ে হাত চালিয়ে খিল খোলা যায় অনায়াসে।

কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা আছে তাতে—শব্দ হতে পারে। কেউ জেগে উঠলেই বিপদ। বরং দরজার খিল না খুলে জানলা দিয়ে যা হয় কিছু নেবার চেষ্টা করা যাক। সুরেশ ভাল করে চারপাশে তাকাতে লাগল।

দেওয়ালের গায়ে একটা পাঞ্জাবি ঝুলছে। যদি পকেটে কিছু থাকে। সুরেশ খুব সাবধানে হাত বাড়িয়ে পাঞ্জাবি টেনে নিল। বেশ ভারী ঠেকছে যেন। নিশ্চয়ই ভরা মানিব্যাগ আছে পকেটে। হ্যাঁ ঠিক তাই। ব্যাগ বের করে সুরেশ জানলা দিয়ে পাঞ্জাবিটা আবার ছুঁড়ে ফেলল ঘরের মধ্যে।

যাক আর ভাবনা নেই। এখন কিছুদিন চলবে। সুরেশ দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে চলল। যামিনীর নিশ্চয়ই ঘুম ভাঙেনি একবারও ! ঘুমুলে সে জাগে ভোরবেলা। আজ যদি তার ঘুম ভেঙে যায় তাহলেই মুশকিল।

মানিব্যাগে সত্যি অনেক কিছুই ছিল। পরদিন সকালে যামিনীর হাতে একটা দশ টাকার নোট তুলে দিয়ে সুরেশ বলল, ওই দিয়ে তো চালা কিছুদিন—

যামিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় পেলে ?

সুরেশ হেসে বলল, বলেছিলাম না তোকে যে রোজগার আমি করবই যেমন করে হোক ?

কিন্তু রাত্রের মধ্যে তুমি এত টাকা পেলে কোথায় বাবা ?

চুপ, যামিনীকে সাবধান করল সুরেশ, কাউকে কিছু বলিস না। আমি সব অভাব দূর করে দেব এবার—

কিন্তু টাকা তুমি পেলে কোথায় বাবা ?

ওসব তুই বুঝতে পারবি না।

যামিনী সত্যিই কিছু বুঝতে পারল না।

সুরেশের নতুন জীবন আরম্ভ হল। খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। কিন্তু এ-পাড়ায় আর নয়, নানা জায়গায় ঘোরে সে আজকাল। ট্রামে বাসে সাবধানে লোকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়, দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে পাউডারের টিন কিংবা এসেন্সের শিশি পকেটে ভরে।

বাসে ট্রামে মাঝে মাঝে লোক তাকে আজকাল সন্দেহ করে। করে করুক। সুরেশকে হাতে হাতে ধরার সাধ্য কারোর নেই।

সুরেশ ভেবেছিল যামিনী কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে তেমন বোকা মেয়ে নয়। প্রথম থেকেই সে তাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল আর একদিন শেষ রাত্রে যামিনীর কাছে ধরা পড়ে গেল সুরেশ।

কে ?

আমি ?

তুমি এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে বাবা ?

যাইনি তো কোথাও।

একটু আগে ডেকে ডেকে সাড়া পেলাম না তোমার।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রে।

কিন্তু তোমার বিছানা খালি দেখলাম যে।

সর্ব্বনাশ। যামিনী সব বুঝতে পেরেছে নাকি? রাগ হল সুরেশের। রাত্রে মেয়েটা ঘুমোয় না কেন?

যামিনী হাসি চেপে বলল, আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে—

খুব আস্তে সুরেশ জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

চুরি করতে—

চমকে সুরেশ বলল, দূর!

যামিনী হেসে বলল, আমি অনেকদিন থেকে জানি বাবা। বেশ করছ তুমি। না খেয়ে তো আর দিন কাটাতে পারি না।

যাক, সুরেশের মাথা থেকে বোঝা নেমে গেল। যামিনী হাসছে। বুদ্ধি আছে মেয়েটার। তাই তাকে ভাল লাগে সুরেশের। যামিনীর কথায় খুশি হল সে। তার বুক অনেক হাল্কা হয়ে গেল যেন। এসব মেয়ের কাছে বেশিদিন লুকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

শুতে যা এবার।

তুমি শোবে না বাবা?

শোব না তো কি করব?

আজ কি আনলে?

কিছু না রে।

পেলে না বুঝি কিছু?

পেয়েছিলাম কিন্তু আনতে পারলাম না।

ওরা ঘুমতে গেল।

হঠাৎ একদিন কাজলকে সঙ্গে নিয়ে কামিনী এল সুরেশকে প্রণাম করে তার কাছে ক্ষমা চাইতে। ক্ষমা করবে না কেন সুরেশ? বড় মেয়ে যে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে।

কামিনীকে দেখে খুব খুশি হল সুরেশ। চেহারা দেখলেই বোঝা

যায় খুব সুখী হয়েছে সে। গয়না যেন আর ধরে না তার গায়ে। বড়লোকের বউ সে।

তোমার এই হারটা কী সুন্দর দিদি।

পরবি নাকি যামিনী?

তুমি দেবে?

বাঃ দেব না কেন? কত আছে আমার, হার খুলে যামনীর গলায় পরাতে পরাতে কামিনী বলল, তুই পর যতদিন তোর খুশি।

কবে দেব তোমাকে?

আমরা তো এখন উত্তরপাড়ায় থাকব। যখন তোর ইচ্ছে হবে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিস।

সত্যি পরতে দেবে অতদিন?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

কাজলদা বকবে না?

উঃ, তেমন লোকই নয় ও।

তারপর একসময় আবার শিগগির আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজল আর কামিনী চলে গেল। ওরা যাবার সময় অকারণে জল এসে পড়ল সুরেশের চোখে।

এই দেখ বাবা—

হার কোথায় পেলি রে যামিনী?

দিদি পরতে দিয়ে গেছে।

পর—পর। আমি তো আর তোকে কিছু দিতে পারলাম না—

ও কথা বল না বাবা, একটু চুপ করে থেকে যামিনী বলল, আচ্ছা, কোথাও কি একটা কাজ পাও না তুমি?

কেন বল তো, মেয়ের কথা শুনে অবাক হল সুরেশ।

কোনদিন ধরা পড়ে যদি জেলে যাও? দিদি জামাইবাবু কি ভাববে তাহলে?

হুঁ, সুরেশ হেসে বলল, তোর বাবাকে জেলে পাঠায় এখনও এমন কেউ জন্মায়নি রে যামিনী—

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না যামিনীর। সারাদিন শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ওদিকে কামিনীরও অসুখ করেছে। শিগগির বোধহয় ওরা বাইরে চলে যাবে।

কার হাতে দিদির হারটা ফেরৎ পাঠাই বল তো বাবা? দেরি হয়ে গেল। কি ভাববে ওর শ্বশুরবাড়ির লোক? দিদির অসুখ, আমিও যেতে পারি না। দিদিকে লিখেছিলাম কাজলদাকে পাঠিয়ে দিতে—

আমাকে অনেক করে যেতে লিখেছে কাজল। কামিনীর নাকি খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। কাল চলে যাই, কি বলিস?

হ্যাঁ যাও—

হারটা আমার হাতে দিস। আমি দিয়ে দেব তখন—

না না বাবা, যামিনী ভয় পেয়ে বলল, পরে পাঠাব। আমি সেরে উঠি, নিজে গিয়ে দিয়ে আসব একদিন।

মেয়ের কথা শুনে হিম হয়ে গেল সুরেশের সমস্ত শরীর। যামিনীর চোখে মুখে ফুটে উঠল অব্যক্ত ভয়ের রেখা। এ দৃষ্টি সে চেনে। ট্রামে বাসে কারোর পাশে বসতে গেলে এমনি সন্দেহ চোখে নিয়ে কেউ কেউ তার দিকে তাকায়। কিন্তু এর আগে আর কখনও সুরেশ এত ভয় পায় নি।

মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে সে পুকুরের ধারে এসে দাঁড়াল। চোখে জল জমে উঠেছে তার। আজ অনেকদিন পর আবার তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল।

সেই দামিনী—যে একদিন এই পুকুরে ডুবে মরেছিল।

২৭শে সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬
বৃহস্পতিবার সকাল : কলিকাতা

॥ বিজুলী ঝলক ॥

ঘর সাজিয়ে নন্দরাণী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল।

দেয়ালের রঙের সঙ্গে মিলেছে সোফার রঙ, টেবিলের ওপর এক রঙের ছাইদান। সকাল বেলা দামী কার্পেট দিয়ে গেছে নারায়ণ আর আগে থেকেই পর্দা টাঙান ছিল।

নন্দরাণী ভাল করে দেখল একবার। না কোন খুঁত নেই আর। চাকরটা নেপালী, কিন্তু তাকে দিয়ে ইসারায় কাজ করিয়ে নিতে তার কোন অসুবিধা হয়নি।

সূর্যের তেজ স্তিমিত হয়ে এল। সোফায় গা এলিয়ে দিল নন্দরাণী। সন্ধ্যার আগে বাসুদেব বাবুকে সঙ্গে নিয়ে আসবে নারায়ণ।

সে বারবার নন্দরাণীকে বলেছে, তাঁর অভ্যর্থনার যেন কোন ত্রুটি না হয়। বাসুদেব বাবুকে খুশি করতে পারলে তার ছবিতে নামা ঠেকায় কে! অত বড় পরিচালক ক জন আছে বাংলা দেশে।

অভ্যর্থনার ত্রুটী হবে কেন? নন্দরাণী নতুন নাকি? সারা জীবন তো এই করেই কাটাল। নারায়ণের কথা মনে করেই তার হাসি পেল। নন্দরাণীকে কি ভাবে সে?

খুব ভাল করে সাজবে সে আজ। বড় ঘরের বউএর মতো মনে হবে তাকে। সাজতে জানে নন্দরাণী। তাকে আদব-কায়দা শেখাবার জন্যে অনেক খরচ করেছে নারায়ণ। আজ কাল তার জন্যেই সে বেশ ভাল ইংরেজী বলতে পারে। দেখা যাক বাসুদেব বাবুর তাকে মনে ধরে কিনা।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখল নন্দরাণী। আপন মনেই হাসল সে। অনেক আগেই তার ছবিতে নামা উচিত ছিল। তাহলে এতদিনে দেশসুদ্ধ লোক জানত তার নাম। যারা ছবিতে অভিনয় করে তাদের মধ্যে তার মত সুন্দরী ক জনই বা আছে।

বাইরে বেরিয়ে এল নন্দরাণী। চমৎকার বাগান করেছে নারায়ণবাবু! একবার তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। দূরে মালী কাজ করেছে। রান্নাঘরে বাবুর্চিকে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে! নন্দরাণী আস্তে আস্তে গেটের কাছে এল।

এ দিকটা তার অপরিচিত নয়! শনি রবিবার আর ছুটির দিনে নারায়ণ বাবু তাকে লস্করপুরের এই বাগান বাড়িতে নিয়ে আসে! এখানে আসতে পেলে নন্দরাণী বেঁচে যায়। বৌবাজারে গলির মধ্যে থাকতে আর ভাল লাগে না তার। এমন বাগান বাড়িতে সে চিরকালের জন্যে থাকতে চায়।

গেট খুলে বাইরে এল নন্দরাণী। কলকাতায় এমন দৃশ্য চোখে পড়ে না। দূরে অসংখ্য গাছের সারি। ফাঁকা মাঠ। টানা পথ চলে গেছে অনেক দূর।

সেই পথ ধরে সে এগিয়ে যেতে লাগল! এখনও অনেক সময় আছে। একটু ঘুরে এলে ক্ষতি কি। অন্ধকার হতে দেরি আছে অনেক।

হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনে নন্দরাণী আশ্চর্য হল! এদিকে আবার ছোট মেয়ে এল কোথা থেকে! বাড়ি তো চোখে পড়ে না একটাও। একটু দূরে বড় গাছের পাশে এসে সে দেখল একটি ফুটফুটে মেয়ে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে।

এই খুকি কাঁদছ কেন?

মেয়েটি নন্দরাণীর প্রশ্ন শুনে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার কান্না থামল কিন্তু মুখে কথা ফুটল না।

নন্দরাণী আবার জিজ্ঞেস করল, কাঁদছিলে কেন ?

হারিয়ে গেছি।

এদিকে এসেছিলে কেন ?

বেড়াতে এসেছি!

মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে নন্দরাণী জিজ্ঞেস করল, কার সঙ্গে এলে তুমি ?

মা এসেছে, বাবা এসেছে—

কোথায় তারা ?

জানি না। তুমি খুঁজে দাও—

নন্দরাণী হেসে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি ?

ডলি।

বাঃ সুন্দর নাম! কিন্তু এখন কি করবে তুমি ?

বাড়ি যাব! তুমি নিয়ে চল!

কোথায় তোমার বাড়ি ?

মেয়েটি শহরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দিকে!

আমাকে তুমি কোলে করে নিয়ে চল।

ও বাবা, নন্দরাণী হেসে বলল, অত দূরে যাব কেমন করে ?

ডলি অসঙ্কোচে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমাদের মোটর আছে।

তাই নাকি ? কই তোমার মোটর ?

হারিয়ে গেছে—

তাহলে যাব কেমন করে ?

হেঁটে হেঁটে—

আর একটু পরে অন্ধকার হয়ে যাবে। কাদের বাড়ির মেয়ে ডলি ? তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে ইচ্ছে হল না নন্দরাণীর! একে একা ফেলে কোথায় যাবে সে ?

কিন্তু নিয়েই বা যাবে কোথায় ? যদি নারায়ণের বাগান-বাড়িতে

আজকের মতো নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর তাকে বলে•থানায় খবর দিলেই চলবে।

কিন্তু কি ভেবে নন্দরাণী ইতস্তত করল। হঠাৎ কোন কাজ করা উচিত নয়। এসব ঝামেলা নারায়ণবাবু পছন্দ না করতে পারে। বাসুদেববাবু আসবে আজ। তাই রাস্তা থেকে মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কখন কি বিপদ হবে বলা যায় না!

কিন্তু কি করবে সে ডলিকে নিয়ে? বাড়ি থেকে না বার হলেই সব চেয়ে ভাল হত। সময়ও বেশি নেই তার। বাসুদেববাবুর আসবার আগে সাজতে হবে তাকে।

অথচ মেয়েটিকে এমন জায়গায় একা ছেড়ে কিছুতেই যাওয়া যায় না। কি করবে ভেবে না পেয়ে ডলিকে কোলে নিয়ে সে আস্তে আস্তে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

নন্দরাণীকে বেশিদূর অগ্রসর হতে হল না। কয়েক পা চলবার পর বার বার মোটরের হর্ন বাজল। আলোও দেখা গেল। কয়েক মূহূর্তের মধ্যে ডান দিকের গলি থেকে বেবিয়ে এল এক বিরাট মোটর গাড়ি।

উল্লাসে ডলি চিৎকার করে উঠল, আমাদের মোটর!

তাদের দেখতে পেয়ে ব্রেক কষল সেই গাড়ি। মেয়ের গলা শুনতে পেল নন্দরাণী, এই যে, এই যে!

সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা গাড়ি থেকে নেমে তার কোল থেকে ডলিকে নিয়ে প্রশ্ন করল, কোথায় ছিলে তুমি? দুষ্টু মেয়ে—

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বলল, কোন দিন কোথায় চলে যাবে আর খুঁজে পাবে না। খুব খারাপ স্বভাব হচ্ছে ওর। আর একটু দেরি হলে কি হত বল তো?

ডলিকে আদর করে সেই মহিলা বলল, কি আবার হত? আমরা কেঁদে মরতাম, এতক্ষণ পর নন্দরাণীর দিকে দৃষ্টি পড়ল

তার, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আপনি একে পেলেন কোথায় ?

নন্দরাণী হেসে বলল, ওই গাছ তলায় বসে কাঁদছিল—

ছি, ছি, এই ফাঁকা জায়গায় কেউ আসে ? কোনদিন কি বিপদ হবে কে জানে।

ছোট মেয়েরা অমনি করেই থাকে।

ভদ্রলোক বলল, অনেক ধন্যবাদ। চলুন এবার ত আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, কোনটা আপনাদের বাড়ি ?

না না পৌঁছে দেবার কোন দরকার নেই, ব্যস্ত হয়ে নন্দরাণী বলল, ওই যে, কাছেই আমাদের বাড়ি। একটু বেড়িয়ে আমি হেঁটেই চলে যাব।

ওই বাড়ি ? ভদ্রলোক বলল, কারা থাকে ওখানে ? শুনেছি ওটা এক মিস্টার বসাকের বাড়ি ?

হ্যাঁ, মাটির দিকে তাকিয়ে নন্দরাণী বলল, আমি তাঁর স্ত্রী। মাঝে মাঝে মাঝে এখানে পিকনিক করতে আসি।

চমৎকার বাড়িটা কিন্তু। মিস্টার বসাকের রুচিজ্ঞান আছে, সেই বাগান বাড়ির দিকে তাকিয়ে মহিলা বলল, যাক আপনার সঙ্গে আলাপ হল। এবার একদিন ভেতরে গিয়ে বাগানটা দেখে আসা যাবে—

নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক বলল, কি করবে তুমি ? আমাকে একবার হাওড়ায় যেতে হবে—

স্বামীর কথার উত্তরে মহিলা বলল, যাওনা তুমি। এখন একা বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না আমার। এঁর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা আমি ফিরে যাব—

বেশ। আমি যাই তাহলে ?

যাও না। কে আটকে রেখেছে তোমায় ? দেখ খুব বেশি রাত করনা যেন—

ভদ্রলোক হেসে বলল, বলতে পারি না। ডলি আমায় আদর করে দাও—মেয়েকে আদর করে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল ডলির বাবা।

কথাবার্তা শুনে প্রথমেই বুঝতে পেরেছিল নন্দরাণী। মহিলা বাঙালী নয়, কিন্তু সুন্দর বাংলা বলতে শিখেছে। কোন প্রদেশে ওর বাড়ি ঠিক বুঝতে পারল না সে। তার সঙ্গে কথা বলতে ওর খুব ভাল লাগল।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাছেই থাকেন বুঝি?

হ্যাঁ, এই তো ডান দিকে ঘুরলেই আমাদের বাড়ি। নতুন এসেছি এদিকে। এখনও মাস খানেকও হয় নি।

একদিন যাব কিন্তু।

নিশ্চয়ই। চলুন এখন যাবেন?

ডলি নন্দরাণীর শাড়ি টেনে বলল, হ্যাঁ এখনই চল?

না, লক্ষ্মী মেয়ে, আজ নয়, ডলির মার দিকে তাকিয়ে নন্দরাণী বলল, আজ উনি ওঁর এক বন্ধুকে নেমতন্ন করেছেন কিনা, তাই এখুনি আমাকে ফিরে যেতে হবে—

দেখুন, আমি শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট করলাম।

না না, এদিকে এলে এ সময়টা আমি ঘুরে বেড়াই।

ভাগ্যিস বেড়ান, তা না হলে ডলির ভাবনায় আজ সারা রাত আমাদের ঘুম হত না।

নন্দরাণী হেসে বলল, ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। ঠিক সময় নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে যেত।

ছাই যেত, আপনি জানেন না, কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে ডলির মা বলল, ওর জন্যে এক মুহূর্ত আমি শান্তিতে থাকতে পারি না। কখন কোথায় চলে যায় কে জানে!

কী যে বলেন! এমন মা-বাবাকে ছেড়ে কোথায় যাবে ও? ও তো আর বোকা নয়, একটু চুপ করে থেকে নন্দরাণী জিজ্ঞেস করল, একটিই মেয়ে বুঝি আপনার?

হ্যাঁ। আপনার?

হেসে নন্দরাণী বলল, খুব বেশিদিন বিয়ে হয়নি আমার।

আপনাকে দেখেই সে কথা আমি বুঝতে পেরেছি।

আপনার ক বছর বিয়ে হয়েছে?

অনেক দিন, ডলির মা হেসে বলল, চার বছর!

আপনাদেব দেখে কিন্তু সে-কথা মনে হয় না!

খুব মনে হয়। কতক্ষণের জন্যে বা দেখলেন আপনি। বাড়ি গিয়ে দেখুন না একবার। একটু এদিক হলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাৎ করেন।

সব স্বামীই অমন করে থাকে।

ডলির হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে বলল, অন্ধকার হয়ে এল, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই?

নন্দরাণী হেসে বলল, আমিই আপনাকে এগিয়ে দিই—

বেশ চলুন, একটু থেমে সে বলল, কবে আসবেন বলুন?

কয়েকদিন থাকব এ বাড়িতে, যাব বৈকি একদিন।

নিশ্চয়ই যাবেন। আমার নাম কুসুম। একা একা প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে বাড়িতে। উনি তো বাইরে ঘোরেন সারাদিন।

কি কাজ ওঁব?

আর বলেন কেন, ব্যবসা--

উনিও তো ব্যবসা করেন।

নারায়ণের বাগান বাড়ির দিকে তাকিয়ে কুসুম বলল, ওঁর ব্যবসা কত বড়। এমন বাড়ি কজন করতে পারে। শুধু বাড়ি নয়, কী অদ্ভুত রুচি!

হ্যাঁ, ওঁর পছন্দর প্রশংসা সকলে করেন।

করবেন না? হেসে বলল কুসুম, এমন স্ত্রীর সন্ধান পাওয়া কি সোজা ব্যাপার?

নন্দরাণী লজ্জা পেয়ে বলল, যান।

শেষ আলোর রেখাও মিলিয়ে গেল। চারপাশ ঘিরে নামল অন্ধকার। আর দেরি করা যায় না। এবার নন্দরাণীকে ফিরতেই হবে। একটা গাড়ি আসছে এদিকে।

নারায়ণ বাসুদেব বাবুকে সঙ্গে করে আনছে বোধ হয়।

বিব্রত হয়ে নন্দরাণী বলল, এবার আমি যাই ?

ওই যে আমাদের বাড়ি।

বুঝেছি, ঠিক যাব একদিন।

নিশ্চয়ই আসবেন, অন্ধকারে যেতে অসুবিধা হবে না আপনার ?

কিছু না, ডলিকে আদর করে নন্দরাণী বলল, অন্ধকারে ঘোরা অভ্যেস আছে আমার, বাড়ির দিকে সে তাড়াতাড়ি পা চালাল।

সত্যি অন্ধকারে চলা অভ্যেস আছে নন্দরাণীর। তা না হলে এত ভাল ভাবে সে দেখতে পাচ্ছে কেমন করে। তবু এই মুহূর্তে ডলি কুসুম আর তার স্বামীকে ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। ও বাড়িতে কোন দিনও যাবে না সে। আর কোন দিনও তাদের দেখতে পাবে না।

কিন্তু কেন ? কেন সে হতে পারবে না তাদের মতো ? কেন পাবেনা একান্ত আপনার করে ডলির মতো একটি ফুটফুটে মেয়েকে ?

চারপাশে বড় অন্ধকার। নন্দরাণীর পদক্ষেপ মন্থর হল শুধু।

উদ্বিগ্ন হয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল নারায়ণ। নন্দরাণীকে আসতে দেখে কঠিন স্বরে বলল, কি আশ্চর্য, একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার ?

নন্দরাণী লজ্জা পেয়ে বলল, এসে গেছেন নাকি ?

আসবেন না ? কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে তুমি ? এখানে এসেও উপরি রোজগারের চেষ্টা। একটু লজ্জা করে না তোমার ?

ভয় পেয়ে নন্দরাণী বলল, রাগ কর না। আমি খুব শিগগির তৈরি হয়ে নিচ্ছি—

দাঁতে দাঁত চেপে নারায়ণ বলল, নির্লজ্জ।

দ্রুত পায়ে পিছনের দরজা দিয়ে শোবার ঘরে চলে এল নন্দরাণী। চুল ঠিক করাই ছিল। আলমারী খুলে তাড়াতাড়ি চলির ব্লাউজ আর জর্জেটের থান বের করল সে। সাবান দিয়ে মুখ ধুতে সত্যি বেশি সময় লাগল না তার।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাড়ি পরবার সময় হাসি পেল নন্দরাণীর। ওদের সঙ্গে সময় নষ্ট করে পাগলামি করবার কি দরকার ছিল—কি দরকার ছিল প্রলাপ বকবার। বাসুদেব বাবু ব্যস্ত মানুষ। তাঁকে খুশি করতে না পারলে তার নিজের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার।

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রসাধন শেষ করে পর্দা সরিয়ে ড্রয়িংরুমে এল নন্দরাণী। তারপর আস্তে আস্তে এসে সোফায় বাসুদেবের পাশে বসল। হঠাৎ ঠিক করতে পারল না কি বলে কথা আরম্ভ করবে।

নন্দরাণীর দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বাসুদেব বলল, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল।

থ্যাঙ্ক ইউ, মৃদু হেসে নন্দরাণী টেবিলে সাজান গ্লাসে খুব সাবধানে দামী বিলিতি মদ ঢালতে লাগল।

২০শে সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬
বৃহস্পতিবার সকাল : কলিকাতা